ধর্ম শিক্ষা

১ম পরিচ্ছেদ

কার্যকারণ সম্বন্ধ

১
চারি আর্য সত্য

১। এই বিশ্ব দুঃখে ভরপুর। যেমন জন্ম দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, বার্ধক্য দুঃখ, এবং মৃত্যু দুঃখ। একদা যাকে ঘৃণা করেছিল তার সাথে সাক্ষাত দুঃখ, প্রিয়জন হতে দূরে সরে যাওয়াটা দুঃখ, নিজের আত্নতুষ্টির জন্যে বৃথা কষ্ট সহ্য করাটা দুঃখ। সর্বোপরি মানুষ তৃষ্ণা ও আবেগ হতে মুক্ত নয়। তাই মানুষ সর্বদা নিদারুণ দুঃখ যন্ত্রণায় পতিত হয়। ইহাই দুঃখ সত্য।

মানুষের দুঃখ কষ্টের কারণ সন্দেহাতীতভাবে কায়িক ও মায়া মরীচিকাময় বৈষয়িক তৃষ্ণার মধ্যেই দেখা যায়। যদি তৃষ্ণা ও মায়া মরীচিকা তাদের উৎপত্তি স্হলের দিকে গমনাগমন করে তাহলে তাদেরকে কায়িক তৃষ্ণাজাত বলে ধরে নেয়া যায়। অতএব তৃষ্ণা তার প্রবল ইচ্ছা শক্তির উপর ভিত্তি করে বাঁচতে চায় এবং এই তৃষ্ণা তার পছন্দমত উপকরণ খোঁজ করে যদিও তা সময়ে মৃত্যুকেও আলিংগন করে। ইহাই দুঃখের কারণ সত্য।

যদি তৃষ্ণা যা বিশেষতঃ মানুষের কাম চিত্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, যদি তার মূল উৎপাটন করা যায় তাহলে তা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং দুঃখের চির অবসান ঘটবে। ইহাই দুঃখ নিরোধ সত্য।

একটি নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হয়ে মানুষকে এমন এক স্তরে উপনীত হতে হবে যেখানে তৃষ্ণা নেই এবং এমনকি দুঃখও নেই। এই স্তরকে বৌদ্ধদের পরিভাষায় বলা হয় আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা পথ। এগুলো হলো ঃ ১) সম্যক দৃষ্টি, ২) সম্যক সংকল্প, ৩) সম্যক বাক্য, ৪) সম্যক ব্যায়াম, ৫) সম্যক আজীব ৬) সম্যক প্রচেষ্টা ৭) সম্যক

স্মৃতি ও ৮) সম্যক সমাধি। ইহাই দুঃখ মুক্তির একমাত্র পথ।

মানুষের উচিৎ এই সত্যগুলো পরিস্কারভাবে তাদের মানসপটে রক্ষা করা। এই পৃথিবী দুঃখে ভরা এবং যারা এই দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের প্রত্যাশী তাদের জন্য এই সত্যগুলো অনুধাবন করা খুবই প্রয়োজন। তাদেরকে এই পৃথিবীর সমস্ত বৈষয়িক সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে যা দুঃখ কষ্টের একমাত্র কারণ। জীবন যাত্রা যা সমস্ত বৈষয়িক সম্পর্ক মুক্ত এবং সকল প্রকার দুঃখ মুক্ত তা একমাত্র সর্বজ্ঞতাজ্ঞানের মাধ্যমেই সম্ভব। আর এই সর্বজ্ঞতাজ্ঞান লাভ সম্ভব একমাত্র আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনের মাধ্যমে।

২। যারা সর্বজ্ঞতাজ্ঞান লাভের প্রত্যাশী তাদের প্রয়োজন সর্বপ্রথম চারি আর্যসত্যকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করা। ইহা উপলব্ধি ছাড়া তারা সীমাহীন বিভ্রান্তিকর মায়া মরীচিকাময় জীবন যাপন করে থাকে। যারা এই আর্যসত্যকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে তাদেরকে ধর্মচক্ষু সম্পন্ন লোক হিসেবে ধারণা করা হয়।

অতএব, যারা বুদ্ধের শিক্ষাকে অনুশীলন করতে ইচ্ছুক তাদেরকে অবশ্যই চারি আর্যসত্যকে উপলব্ধি করার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে; এবং তাদেরকে ইহার সম্যক অর্থ পরিস্কারভাবে বুঝার চেষ্টা করতে হবে। সর্বকালে একজন সাধক যদি প্রকৃত সাধক হয়ে থাকে, তাহলে প্রথমে সে নিজেই সাধনার সম্যক অর্থ উপলব্ধি করবে এবং এর পরে অন্যকে তা শিক্ষা দেবে।

যখন একজন লোক সম্যকভাবে চারি আর্যসত্যকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে তখন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ তাকে লোভ থেকে মুক্ত হতে সহযোগিতা করবে। যদি কোন ব্যক্তি লোভ হতে মুক্তি লাভ করে তাহলে সে বৈষয়িক ব্যাপারে কলহ করবে না। সে প্রাণী হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, প্রতারণা, বিশ্বাসভঙ্গতা, চাটুকারীতা, ঈর্ষা ইত্যাদি হতে বিরত থাকবে। সে কখনও মানসিক ভারসাম্যতা হারাবে না; সে কখনও জীবনের নশ্বরতাকে ভুলে যাবে না এবং কখনও অযৌক্তিক কথা/বার্তা বলবে না।

৩। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকে অনুসরণ করা মানে অন্ধকার ঘরে আলো হাতে নিয়ে প্রবেশ করার ন্যায়। আলো নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলে জমাট অন্ধকার ঘর থেকে পালিয়ে যাবে এবং পুরো ঘর আলোকিত হয়ে উঠবে।

মানুষের মধ্যে যারা আর্যসত্যের অর্থ উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকে অনুসরণ করার কথা শিক্ষা করেছেন, তাঁরা প্রজ্ঞারূপ আলোর সন্ধান পেয়েছেন, যার দ্বারা অবিদ্যারূপ অন্ধকারকে তাঁরা ধ্বংস করতে সক্ষম।

বুদ্ধ মানুষের পথপ্রদর্শক সদৃশ। তিনি তাদেরকে সঠিকভাবে চারি আর্যসত্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেন। যাঁরা সম্যকভাবে ইহা উপলব্ধি করেন তাঁরা সর্বজ্ঞতাজ্ঞান লাভ করেন। তাঁরা অন্যজনকেও এই পৃথিবীর বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে পথপ্রদর্শক হয়ে সাহায্য করতে পারেন এবং তাঁরা পূত পবিত্র ও বিশ্বস্ত হতে পারেন। যখন সাধক এই চারি আর্যসত্যকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন তখন তিনি এই পৃথিবীর সমস্ত বৈষয়িক উপাদান হতে নিজেকে আলাদা করতে পারেন।

চারি আর্যসত্যকে সম্যকভাবে উপলব্ধির পর বুদ্ধের অনুসারীরা অন্যান্য সব আধ্যাত্মিক সত্যকে দর্শন করেন। তাঁরা প্রজ্ঞা এবং আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে সবকিছুর অর্থ অনুধাবন করতে সক্ষম এবং পৃথিবীর সবাইকে ধর্ম ভাষণ করার ক্ষমতা অর্জন করেন।

২
কার্যকারণ সম্বন্ধ

১। সকল মানুষের দুঃখ কষ্টের পিছনে কারণ আছে; আর এই দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি লাভের পথও আছে। কারণ এই পৃথিবীর সমস্ত কিছুই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সংগঠিত সীমাহীন কার্য-কারণের ফল স্বরূপ। কার্য-কারণের পরিবর্তনের সাথে আবার ফলেরও পরিবর্তন এবং অবসান ঘটে।

বৃষ্টি পড়ে, বাতাস প্রবাহিত হয়, গাছ বড় হতে থাকে, গাছের পাতা পরিপক্কতা লাভ করে এবং ঝরে পড়ে। এই সব অবস্হা কার্য-কারণ নিয়মে একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত এবং এভাবে আবহমান কাল হতে চলে আসছে। আবার এই কার্য-কারণ নিয়মের পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের অবস্হারও পরিবর্তন এবং অবসান ঘটে।

এই দেহ পিতামাতার দ্বারা সৃষ্ট। আবার এই দেহ খাদ্যের মাধ্যমে যত্ন নেয়া হচ্ছে এবং ইহা শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পুষ্টি সাধিত হয়ে আসছে।

অতএব শরীর ও মন দু'টিই একে অন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং অবস্হার পরিবর্তনে তাদেরও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

একটি জাল যেমন ধারাবাহিক সুতার গিঁটের মাধ্যমে তৈরী করা হয়, তদ্রুপ এই পৃথিবীর সমস্ত কিছুই ধারাবাহিক সুতার গিঁটে আবদ্ধ। যদি কেহ ধারণা করেন যে, জাল বুনানির ফাঁকগুলো এক একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র জিনিস; তাহলে তিনি ভুল করবেন।

ইহাকে জাল বলা হয় এই কারণে যে ইহা ধারাবাহিকভাবে বুনানির ফাঁকগুলোর মাধ্যমে একে অপরের সাথে সম্পর্ক যুক্তভাবে তৈরী করা হয়েছে; এবং প্রত্যেক ফাঁকের নির্দিষ্ট স্হান ও দায়িত্ব আছে যা এক ফাঁক অন্য ফাঁকের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

২। ফুলের কলি জন্মায় কারণ ইহা তার ধারাবাহিকতা, যা পরবর্তীতে প্রস্ফুটিত হয়। গাছের পাতা ঝরে পড়ে কারণ ইহাও তার ধারাবাহিকতা। পুষ্প কলি স্বাধীনভাবে জন্মায় না, তদ্রুপ গাছের পাতাও স্বাধীনভাবে ঝরে পড়ে না যখন পর্যন্ত তার সময় উপস্হিত না হয়। অতএব, এই পৃথিবীর সমস্ত কিছুই হঠাৎ করে স্বাধীন ভাবে জন্মও নেয় না এবং মৃত্যুও বরণ করে না। সমস্তই তার অবস্হার পরিবর্তনে পরিবর্তিত হচ্ছে মাত্র।

কার্যকারণ সম্বন্ধ

ইহাই পৃথিবীর চিরন্তন সত্য এবং অপরিবর্তনীয় নিয়ম যে, সমস্ত কিছুই ধারাবাহিক কার্য-কারণ নিয়মে সৃষ্টি হয়েছে এবং পুনঃ একই নিয়মে ধ্বংসও হবে। সব কিছুই পরিবর্তনশীল এবং কিছুই চিরদিন অবস্থান করবে না।

৩

প্রতিত্যুৎসমুদপাদ নীতি

১। মানুষের দুঃখ, শোক, বেদনা এবং নিদারুণ যন্ত্রণার উৎস কোথায় ? সচরাচর ইহা মানুষের ভোগ লালসার মধ্যে দেখা যায় কি না ?

দুর্দমনীয় ভাবে জীবন যাপনের জন্যে মানুষ সম্পদ ও সম্মান, আরাম-আয়েশ, আবেগ প্রবণ ও ভোগ পরায়ণতার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। উল্লেখিত বিষয়ের প্রতি অবিদ্যা জনিত কারণে আসক্ত হয়ে পড়াটাই মানুষের দুঃখ কষ্টের মূল কারণ।

ইহার শুরু থেকে পৃথিবী ক্রমান্বয়ে চরম দুর্দশায় পরিপূর্ণতা লাভ করে। ফলশ্রুতিতে অগ্রহণযোগ্য হলেও সত্য যে জ্বরা, বার্ধক্য ও মৃত্যুতে এ জগৎ যেন ভর্তি হয়ে গেলো।

কিন্তু কেহ যদি মনোযোগের সাথে এই সত্যগুলো বিশ্লেষণ করে তাহলে বুঝতে পারবে যে, সকল প্রকার দুঃখ কষ্টের মূলে প্রধান কারণ হিসেবে নিহিত রয়েছে তৃষ্ণা বা প্রবল আকাংখা। যদি লোভ লালসার এই তৃষ্ণা হতে মুক্ত হওয়া যায় তাহলে মানুষ দুঃখ কষ্ট হতে চিরতরে মুক্তি লাভ করতে পারবে।

লোভের মধ্যেই অবিদ্যা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যা মানুষের মনকে তৃপ্ত করে।

এই অবিদ্যা উৎপন্ন হয় মনের অসচেতনতার দরুন। আর এ অসচেতনতার দরুন বস্তুর ধারাবাহিক বিবর্তনের কারণও অজানা থেকে যায়।

অবিদ্যা ও লোভ হতে হঠাৎ অকুশল চিত্তের উৎপত্তি হয় এবং এতে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বুঝা যায় না; কিন্তু মানুষ তারপরেও বিরামহীনভাবে এবং বেপরোয়াভাবে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ খুজঁতে থাকে।

অবিদ্যা এবং লোভের কারণে মানুষ বৈষম্যমূলক আচরণ করে থাকে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেখানে বৈষম্যের কোন স্হান নেই। জন্মগতভাবে মানুষের স্বভাবের মধ্যে কোন শুদ্ধ ও ভুলে এই বৈষম্য নেই; কিন্তু মানুষ অবিদ্যার কারণে, অনুমানের ভিত্তিতে শুদ্ধ ও ভুলের বৈশিষ্ট্য এবং স্বরূপ বিচার করে থাকে। অবিদ্যার কারণে তারা সর্বদা অকুশল চিন্তা করে থাকে এবং সর্বদা কুশল দৃষ্টি হতে দূরে সরে থাকে। তারা তাদের আত্মাবাদের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে; এতে তারা অকুশল কাজে নিয়োজিত হয়। এর ফলশ্রুতিতে তারা মোহের রাজ্যে অনুরক্ত হয়।

অহংবোধ মানুষের কর্ম সৃষ্টির ভূমি হিসেবে কাজ করে থাকে। মন বীজ হিসেবে বৈষম্যের কারণ হয়ে কাজ করে থাকে। অবিদ্যা দ্বারা মন আচ্ছাদিত হয়। এই মনকে উর্বর করে তৃষ্ণা রূপ বৃষ্টির জল। আর এই তৃষ্ণাকে ইন্ধন যোগায় আত্ম জাহির করার মত একগুয়েমি প্রবণতা। এগুলোর সাথে অকুশল যুক্ত হয় এবং এই অকুশল অবস্হা মোহ রূপে আবির্ভূত হয়ে অবস্হান করে।

২। সুতরাং বাস্তবতার দিক থেকে বলা যায়, নিজেদের মনই দুঃখ রূপ মোহ, অনুশোচনা, বেদনা এবং মৃত্যু যন্ত্রণার মূল কারণ।

মোহাচ্ছন্ন এই জগৎ কিছুই না; ইহা শুধু ছায়া স্বরূপ মনের মাধ্যমে বিভিন্ন কিছুর বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছে মাত্র। আবার সে একই মনের মাধ্যমে সর্বজ্ঞতাজ্ঞানও লাভ করা সম্ভব।

৩। এই পৃথিবীতে ৩টি ভুল ধারণা রয়েছে। যদি কেহ এই ভুল ধারণাগুলোর প্রতি আসক্ত পরায়ণ হয়ে পড়ে, তাহলে এই পৃথিবীর অন্যান্য সকল কিছুই তার সম্মুখে ভুল হিসেবে প্রতীয়মান হবে।

কার্যকারণ সম্বন্ধ

এই ভুল ধারণাগুলোর প্রথমটি হলো ঃ মানুষের সমস্ত কিছুই নিয়তির উপর নির্ভর; দ্বিতীয়টি হলো, এই পৃথিবীর সমস্ত কিছুই সৃষ্টি কর্তার দ্বারা সৃষ্ট এবং সমস্ত কিছুই তার ইচ্ছা শক্তির দ্বারা পরিচালিত এবং তৃতীয়টি হলো, সমস্ত কিছু কোন কার্য-কারণ ছাড়া সৌভাগ্যক্রমেই ঘটছে।

যদি সমস্ত কিছুই নিয়তির দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহলে ভাল কাজ এবং খারাপ কাজ করা দু'টিই পূর্বনির্ধারিত; সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্যও পূর্বনির্ধারিত; এমন কোন কিছুই সংগঠিত হতে পারে না, যা পূর্ব নির্ধারিত নয়। এরূপ হলে মানুষের উন্নতি ও অগ্রযাত্রার জন্যে গৃহীত সকল পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা অর্থহীন হয়ে পড়বে এবং মানব সমাজ আশাবিহীন হয়ে পড়বে।

অন্য দু'টি ভুল ধারণাও উল্লেখিতভাবে বুঝতে হবে। যদি সমস্ত কিছুই অদৃশ্য শক্তি বা অন্ধ ভাগ্যের উপর নির্ভর করতে হয়, তাহলে মানুষের আর কি অভিলাষ থাকতে পারে, শুধু মেনে নেয়া বাদে ? ইহা বিস্ময়ের কিছু নয় যে, যারা এই ভুল ধারণা নিয়ে অবস্হান করছে তারাও কিন্তু বাস্তবে আশাহীন এবং শ্রমবিমুখ নহে; তাদের দ্বারাও বিজ্ঞজনোচিৎ কাজ করা এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা সম্ভব হচ্ছে। কারণ, প্রয়োজনের বাস্তবতা তাদেরকে বাধ্য করছে।

অতএব উল্লেখিত ৩টি ধারণাই ভুল। সমস্ত কিছুই আনুক্রমিকভাবে হচ্ছে, যার উৎস হলো কার্য-কারণের সমষ্টি।

২য় পরিচ্ছেদ

মনস্তত্ত্ব ও বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ

১

অনিত্য ও অনাত্মা

১। যদিও শরীর ও মন উভয়ে যুক্ত কারণেই আবির্ভূত হয়, এর অর্থ এই নয় যে এখানে অহংবোধ কাজ করছে। এই মাংসপিন্ডবৎ শরীর, ধাতুর সমষ্টিমাত্র; সুতরাং ইহা অনিত্য।

যদি এই দেহ আমার আমিত্ব বোধের সমষ্টি হতো, তাহলে ইহা যা খুশী তাই করতে পারতো।

ধরুন, একজন রাজা তাঁর শক্তি বলে অন্যকে প্রশংসাও করতে পারেন, আবার শাস্তিও দিতে পারেন। কিন্তু সেই রাজাই আবার তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অসুস্হও হয়ে পড়েন, বার্ধক্যও হয়ে পড়েন, আবার মৃত্যুও বরণ করেন। দেখা যায় তাঁর ভাগ্য এবং আশা এই দু'ই খুব কমই পরিপূর্নতা লাভ করে।

এভাবে দেখলে বুঝা যাবে মনের মধ্যে কোন আমিত্ব বোধ নেই। মানুষের মন কার্য্য-কারণের সমষ্টি মাত্র। তাই ইহা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে।

যদি মন আমিত্ববোধের দ্বারা পরিচালিত হতো তাহলে তার ইচ্ছামত যা খুশী তাই করতো। কিন্তু মন অনবরত ভালো এবং মন্দের পেছনে পেছনে ঘুরছে। যদিও মনের ইচ্ছামত কিছুই ঘটছে না।

২। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে এই দেহ কি অবিনশ্বর নাকি নশ্বর, তাহলে সে অবশ্যই নীতিগতভাবে প্রত্যুত্তরে বলবে "নশ্বর"।

মনস্তত্ত্ব ও বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে নশ্বরতা কি সুখের না দুঃখের ? সাধারণত প্রত্যুত্তরে বলবে "দুঃখের"।

যদি কেহ বিশ্বাস করে যে এই নশ্বরতা, পরিবর্তনশীলতা এবং দুঃখে পরিপূর্ণ পৃথিবীটাই স্হায়ী। এরূপ মনে করাটা মারাত্নক ভুল।

মানুষের মনও নশ্বর এবং দুঃখে পরিপূর্ণ। এখানেও আমিত্ব নামের কিছুই নেই।

আমাদের দেহ ও মন যা স্বতন্ত্র জীবন দ্বারা গঠিত, এবং যাকে ঘিরে আছে এই বাহ্যিক জগৎ, ইহা 'আমি' ও 'আমার' এই উভয় ধারণা হতে অনেক দূরে।

খারাপ চিন্তা চেতনার মাধ্যমে স্বচ্ছ মনকে যেমন কলুষিত করা হয়, তদ্রুপ প্রজ্ঞার উৎপত্তিতে সকল বাঁধা মুক্ত হয়। একইভাবে, খারাপ চিন্তা চেতনার মাধ্যমে মনে একগুয়েমির ন্যায় 'আমি' ও 'আমার' নামক এই সকল ভাবেরও উদয় হয়।

শুরু থেকেই এই দেহ ও তার চারিপার্শ্বের জিনিষগুলো কার্য্য-কারণ নীতির মাধ্যমে গঠিত এবং এগুলো প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে; যার কোন পরিসমাপ্তি নেই।

মানবীয় মনের পরিবর্তন কোন সময়েও বন্ধ হবে না, ইহা নদীর পানির স্রোতের ন্যায় অথবা বাতির জ্বলন্ত অগ্নি শিখার ন্যায়, অথবা সারাক্ষণ লাফানো বানরের ন্যায়, যা এক মুহূর্তের জন্যেও স্হির থাকতে পারে না। একজন বিজ্ঞ ব্যক্তিকে এগুলো দেখে এবং শুনে শরীর অথবা মনের দ্বারা সৃষ্ট যে কোন আসক্তি থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা করা উচিৎ; যদি তিনি কোনদিন জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হন।

৩। এই পৃথিবীতে ৫ প্রকার জিনিস আছে, যা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণকারীরা কোন দিন কেহই অতিক্রম করতে পারেনি। এগুলো হলো ঃ প্রথমতঃ বার্ধক্য হতে মুক্তি লাভ; দ্বিতীয়তঃ শারীরিক অসুস্হতা থেকে চিরমুক্তি লাভ, তৃতীয়তঃ মৃত্যুর

হাত থেকে মুক্তি লাভ; চতুর্থতঃ ধ্বংসের হাত থেকে মুক্তি লাভ এবং পঞ্চমতঃ নিঃশেষিত অবস্হা থেকে মুক্তি লাভ।

সচরাচর মানুষ এগুলোর মাঝেই কালাতিপাত করছে এবং বেশীর ভাগ মানুষই পর্যায়ক্রমে দুঃখ ভোগ করে আসছে। কিন্তু যারা বুদ্ধের শিক্ষাকে বুঝেছে এবং চর্চা করছে তারা কষ্ট ভোগ করে না, কারণ তারা জানে এগুলোকে এড়ানো যায় না।

এই পৃথিবীতে চার প্রকার সত্য আছে। এগুলো হলো, প্রথমতঃ সমস্ত প্রাণী অজ্ঞানতা থেকে আবির্ভূত হয়েছে; দ্বিতীয়তঃ তৃষ্ণাজাত সমস্ত কিছুই অনিত্য, অনিশ্চিত এবং দুঃখ উৎপাদক; তৃতীয়তঃ এ পৃথিবীর সমস্ত জিনিসই অনিত্য, অনিশ্চিত এবং দুঃখদায়ক; চতুর্থতঃ এই পৃথিবীতে আমিত্ব বলতে কিছুই নেই এবং আমার বলতেও কিছুই নেই।

এই চারি প্রকার সত্যের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, এই পৃথিবীর সমস্ত কিছুই অনিত্য, ক্ষয়শীল এবং অনাত্মধর্মী; এতে বুদ্ধের উৎপত্তি অথবা অনুৎপত্তির কোন সম্পর্ক নেই। পৃথিবীতে এই চারি প্রকার সত্যের অবস্হান বিদ্যমান। বুদ্ধ এগুলোকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেছেন এবং সকলের জন্যে এই সত্য ধর্ম প্রচার করে গেছেন।

২
মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে

১। মোহ এবং সর্বজ্ঞতা দু'টিই মনের মধ্যে উৎপন্ন হয় এবং সমস্ত বস্তুর অস্তিত্বও মনের ক্রিয়ার দ্বারাই সৃষ্ট; যা যাদুকরের ডিগবাজীর ন্যায় বিভিন্ন আকার ধারণ করে।

মনের কার্যকলাপের কোন পরিসীমা নেই এবং মন আমাদের জীবনের পারিপার্শ্বিক অবয়বও তৈরী করে। অশোভন চিত্তের মাধ্যমে অশোভন কিছুর সৃষ্টি হয়; আবার শোভন বা সুন্দর চিত্তের মাধ্যমে সুন্দর কিছুর সৃষ্টি হয়। মনের

মনস্তত্ত্ব ও বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ

এই কার্য-কলাপের মধ্যে এবং পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে কোন সীমা পরিসীমা নেই।

যেমন একজন চিত্রকর একটি চিত্র অংকন করলো এবং এর চারিপার্শ্বে যা কিছু অংকিত হলো, তা তার মনের দ্বারাই সৃষ্ট। যদি বুদ্ধের দ্বারা চারি পার্শ্বে কোন কিছু সৃষ্ট হয়, তা হবে অনাবিল ও আসব মুক্ত। কিন্তু সাধারণ মানুষের দ্বারা সৃষ্ট বস্তু সেরূপ হয় না।

মন আপন চাতুর্য্যে বহুবিধ রূপ ধারণ করতে পারে, যেমন পারে একজন দক্ষ তুলিকার তার তুলির মাধ্যমে এই পৃথিবীর বিভিন্ন ছবি অংকন করতে। এই পৃথিবীতে এমন কিছুই নেই যা মনের দ্বারা সৃষ্ট হয়নি। ধরুন, একজন বুদ্ধও আমাদের মনের ন্যায়। সুতরাং এদিক থেকে জগতের সমস্ত প্রাণীই বুদ্ধ সদৃশ আমাদের মনেরই সৃষ্ট। অতএব, মন এবং প্রাণী জগতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, যদিও সমস্ত কিছুই যার যার গুনধর্ম বা কর্মানুসারেই সৃষ্ট।

পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর ধর্মতা ও গঠন প্রণালী এবং ইহার ধ্বংস, বুদ্ধ সম্যক দৃষ্টির মাধ্যমে জ্ঞাত হন। সুতরাং অন্য যারা এভাবে জ্ঞাত হবেন তারাই প্রকৃত বুদ্ধকে দর্শন করবেন।

২। কিন্তু মন তার চারিদিকে যা কিছু সৃষ্টি করছে তা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের স্মৃতি, ভয় ও অনুতাপ মুক্ত নয়। কারণ এগুলো অবিদ্যা এবং লালসা থেকে উৎপন্ন হচ্ছে।

এই অবিদ্যা এবং লালসা থেকে মোহ রাজ্যের সৃষ্টি এবং কার্য্য-কারণের সমস্ত জটিলতা মনের মাঝে স্হান দখল করে নেয়; যার ফলশ্রুতিতে আমাদের বর্তমান অবস্হান লক্ষ্য করা যায়।

জীবগণের জন্ম-মৃত্যু মনের মাধ্যমেই সৃষ্ট হয়; আবার তা মনের মাধ্যমেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। জন্ম-মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত মন যখন এগুলো থেকে আলাদা হয়ে যায় তখনই প্রাণীর চ্যুতি ঘটে।

জ্ঞানহীন জীবন থেকে যখন মনের উৎপত্তি ঘটে তখন ঐ মন নিজের স্বভাবজাত কারণে মোহ রাজ্যে বিভ্রান্তিকর অবস্থায় বিচরণ করে। যদি আমরা জ্ঞান অর্জন করতে পারি যে, মনের বাহিরে কোন মোহ রাজ্য নেই, তখনই এই বিচলিত মন শান্ত হবে। যেহেতু আমরা আমাদের চারিপার্শ্বের মোহ রাজ্য থেকে মুক্তি লাভ করবো; সেহেতু আমরা জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হবো।

এভাবেই মনের মাধ্যমে জন্ম-মৃত্যুর রাজ্য সৃষ্টি হয়েছে, যা মনের মধ্যে বন্ধিত, এবং মনের দ্বারা পরিচালিত; মন সমস্ত অবস্থায় প্রধান এবং পরিচালক। দুঃখ রাজ্য মোহ গ্রস্হ মনের দ্বারাই সৃষ্টি এবং আত্মপ্রকাশ করে।

৩। অতএব, সমস্ত কিছুই প্রাথমিকভাবে নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা এবং সৃষ্টি করে আসছে মন। ইহা গরুর গাড়ীর চাকার ন্যায়; গরুকে পিছনে পিছনে অনুসরণ করে। এরূপে দুঃখ ও দোষযুক্ত মনে যদি কেহ কিছু বলে এবং করে তা তাকে পিছনে পিছনে অনুসরণ করে।

কিন্তু কেহ যদি দোষবিহীন মনে কিছু বলে অথবা করে সুখ তাকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করে। যদি কেহ খারাপ কিছু করে থাকে তাহলে তা তার মনে এই বলে জ্ঞাত হয় যে, "আমি খারাপ করেছি," এবং ইহা স্মৃতিতে ধারণ করে রাখা হয়, যা পরবর্তীতে ফল প্রদান করে থাকে। আবার যদি কেহ ভালো কিছু করে থাকে, তাহলে মনে এই বলে ধারণা করা হয় যে, "আমি ভালো করেছি," এবং মন ইহা স্মৃতিতে ধারণ করে রাখে, যা পরবর্তীতে সুখ প্রদান করে থাকে।

যদি দোষযুক্ত মন হয় তাহলে হোঁচট খেয়ে খেয়ে বিপদজনক পথ অতিক্রম করতে হবে এবং অনেক বার পদস্খলন হবে ও কষ্টভোগ করতে হবে। কিন্তু যদি মন দোষমুক্ত হয় তাহলে তার যাত্রা হবে খুবই আরামদায়ক এবং শান্তিময়।

যারা বুদ্ধাঙ্কুর হয়ে শরীর ও মনের বিশুদ্ধিতার মাধ্যমে জীবন যাপন করেন তাঁরা অহংবোধ, মিথ্যা দৃষ্টি এবং তৃষ্ণার জাল থেকে মুক্ত। যাঁর মন শান্ত-সমাহিত তিনি

দিবা-রাত্র বীর্যবন্ত হয়ে অবস্হান করেন।

৩

বস্তুর প্রকৃত অবস্হান বা স্বরূপ

১। এই পৃথিবী সৃষ্টির আদি কাল হতে সমস্ত বস্তু কার্য্য-কারণের দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছে, যার সৃষ্টির পেছনে মৌলিক কোন পার্থক্য দেখা যায় না। মানুষের অযৌক্তিক ও পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই বাহ্যিক পার্থক্য দৃষ্টি গোচর হয়।

ধরুন, আকাশের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিম বলে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু আমরা মানুষেরা নিজেদের সুবিধার্থে নিজের মনের মধ্যে এই পার্থক্যকরণ সৃষ্টি করেছি এবং তাকে চিরন্তন সত্য হিসেবে গ্রহণ করে আসছি।

গাণিতিক শাস্ত্রমতে ১ হতে অসংখ্য সংখ্যা এক একটি সম্পূর্ণ সংখ্যা, এবং এগুলো প্রত্যেকটিই কোন স্বতন্ত্র পরিমাণ বহন করে না। কিন্তু মানুষেরা নিজেদের সুবিধার জন্যে এগুলোকে শ্রেনীভেদ করছে এবং পরিমাণ নির্দেশক হিসেবে প্রকাশ করছে।

স্বাভাবিকভাবে জন্ম এবং মৃত্যুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু মানুষেরাই একটিকে জন্ম এবং অন্যটিকে মৃত্যু বলে প্রভেদ করেছে। মূলত ভাল এবং মন্দ কাজের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। মানুষেরা নিজেদের সুবিধার জন্যে এগুলোকে চিহ্নিত করেছে মাত্র।

বুদ্ধের চিত্তে এগুলোর কোন পার্থক্য দেখা যায় না। উঁচু আকাশ থেকে পৃথিবীর দিকে তাকালে দেখা যায় মেঘ যেমন তার উপর দিয়ে ভেসে বেড়ায়; মনের এই প্রভেদকরণও ঠিক সেরূপ ভেসে বেড়াচ্ছে। বুদ্ধের কাছে সমস্ত কিছুই মায়া-মরীচিকাময়, তিনি জানেন যে, মনের মধ্যে যা কিছু উৎপন্ন হয় এবং বিলয় হয়, তা সমস্তই অনিত্য ও অসার। সুতরাং তিনি মরণফাঁদস্বরূপ ধারণা এবং প্রভেদ-

করণ দৃষ্টিভঙ্গি হতে মুক্ত।

২। মানুষেরা নিজেদের ধ্যান ধারণা মত বস্তুকে উপলব্ধি করে এবং প্রাচুর্য্য, মূল্যবান সম্পদ ও সম্মানকে আঁকড়ে ধরে। তারা দ্রুত ক্ষয়শীল এ জীবনকে জড়িয়ে ধরে থাকে।

তারা ইচ্ছামত স্থায়ী ও অস্থায়ী, ভাল ও মন্দ, সঠিক ও ভুল এর মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করে। মানুষের জন্যে জীবন হলো পরম্পরা এবং আসক্তির ফসল স্বরূপ; যার দরুন তারা মায়ামরীচিকাময় দুঃখ ও বেদনার সম্মুখীন হয়।

একদা এক ব্যক্তি তার দীর্ঘ যাত্রা পথে একটি নদীর ধারে এসে পৌঁছালো। সে নিজেকে নিজে বললো, "নদীর এই পার হাঁটতে খুবই কষ্টকর এবং বিপদজনক, ওপার মনে হয় খুবই সহজ এবং নিরাপদ। কিন্তু কিভাবে আমি এই নদী পার হই ?" পরে সে নদীতে ভাসমান খাগড়া দিয়ে ভেলা তৈরী করে নিরাপদে নদী পার হলো। তারপর সে ভাবলো, "এই ভেলা নদী পার হতে আমাকে খুবই সাহায্য করেছে, তাই আমি ইহা নদীর পাড়ে ফেলে যাব না, সাথেই নিয়ে যাব।" অতঃপর সে নিজে নিজেই অপ্রয়োজনীয় একটি সমস্যা বর্ধিত করলো। এমতাবস্থায়, ঐ লোকটিকে বিজ্ঞজন হিসেবে ধরা যায় কি ?

এই নীতি কাহিনী শিক্ষা দেয়, যদিও ভালো জিনিস, যখন ইহার প্রয়োজনীয়তা নেই, তখন তা ত্যাগ করা উচিৎ। খারাপ কিছু হলে তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বর্জন করা উচিৎ। বুদ্ধ নিজের জীবনে ইহাকে নিয়ম হিসেবে গ্রহণ করেছেন, যাতে নিস্ফল ও অপ্রয়োজনীয় আলোচনা সহসা ত্যাগ করা যায়।

৩। বস্তু নিজে কোন আসা যাওয়া করে না, এমনকি বস্তুর উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতিও নেই। সুতরাং কেহ কোন বস্তু লাভও করতে পারে না, আবার হারাতেও পারে না।

বুদ্ধের শিক্ষানুসারে বস্তুর উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি কোনটাই বিদ্যমান নয়;

মনস্তত্ত্ব ও বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ

যতক্ষণ পর্যন্ত বস্তুর এই 'হ্যাঁ' মূলক উপস্থিতি এবং 'না' মূলক অনুপস্থিতি এ দু'ই ধারণা অতিক্রম না করে। সুতরাং সমস্ত বস্তুর মধ্যে এই মিল দেখা যায় এবং ইহারা কার্য-কারণ নিয়মে বাঁধা। কোন বস্তু নিজে নিজে উৎপন্ন হতে পারে না। ইহাই বস্তুর অবিদ্যমানতা। আবার যেহেতু বস্তুর সাথে কার্য-কারণ নিয়মের সম্পর্ক রয়েছে তাই তাকে বস্তুর অবিদ্যমানতাও বলা যায় না।

বস্তুর প্রতি এঁটে লেগে থাকার কারণ তার প্রতি আসক্তি বা মোহ। বস্তুর আকার বা রূপকে আকঁড়িয়ে লেগে না থাকলে এ মিথ্যা ধারণা এবং অযৌক্তিক আসক্তিও উৎপন্ন হতো না। বিজ্ঞগণ ইহার সত্যতা দর্শন করেছেন এবং এরূপ মূর্খতাপূর্ণ আসক্তি হতে তাঁরা মুক্ত।

পৃথিবীর সমস্ত কিছুই অলীক স্বপ্ন এবং মরীচিকাময় প্রলোভনে ভরা। একটি ছবির প্রতি বাহ্যিকভাবে যে ধারণা জন্মায়, তেমনি অন্য যে কোন বস্তুও আসলে একই সত্যতায় বিদ্যমান। বস্তুতঃ এদের কোন অস্তিত্বই নেই অথচ উত্তপ্ত ধোঁয়ার ন্যায় এর অবস্হান লক্ষ্য করা যায়।

৪। বস্তুর এই ধারণার প্রতি বিশ্বাস জন্মানোর জন্যে এবং আরও অসংখ্য কারণে বস্তুর সৃষ্টি। বস্তুর প্রতি মানুষের এই ধারণা অনন্তকাল ধরে চলে আসছে, যা মারাত্নক ভুল এবং একেই বস্তুর বিদ্যমানতা তত্ত্ব হিসেবে বলা হচ্ছে। কিন্তু এই ধারণাও বড় ধরনের ভুল যে, বস্তু সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, যাকে বস্তুর অ-বিদ্যমানতা তত্ত্ব বলা হচ্ছে।

একইভাবে জীবন-মরণ, চিরস্হায়ী-অস্হায়ী, বিদ্যমানতা-অবিদ্যমানতা ইত্যাদি বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ নহে; কিন্তু মানুষেরা আসক্তিময় চক্ষে তাদের বাহ্যিক অবস্হা লক্ষ্য করে মাত্র। কারণ মানুষের তৃষ্ণাই মানুষকে বস্তুর এই বাহ্যিক অবস্হার সাথে সম্পর্কিত এবং সংযুক্ত করেছে। কিন্তু বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ হিসেবে তারা মুক্ত; কোন প্রকার বৈষম্যতা এবং আসক্তির মধ্যে আবদ্ধ নয়।

যেহেতু সমস্ত কিছুই কার্য-কারণ নিয়মের ধারাবাহিকতার দ্বারাই সৃষ্ট সেহেতু বস্তুর

স্বরূপ নিশ্চিতভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। এতে বুঝা যায় বস্তুর কোন সারতত্ত্ব নেই। ইহা বস্তুর আপাতঃ সত্তা বা অবস্হা মাত্র। এই কারণেই বস্তুর স্বরূপের নিশ্চিত পরিবর্তনকে আমরা মরীচিকাময় এবং কাল্পনিকতার সাথে দর্শন করি। কিন্তু অপরপক্ষে, বস্তুর স্বরূপের এই নিশ্চিত পরিবর্তন মৌলিক আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে স্হির এবং অপরিবর্তনীয়।

একজন সাধারণ মানুষের কাছে নদী সাধারণত নদীর মতই মনে হয়; কিন্তু একটি ক্ষুধার্ত দৈত্যের কাছে ঐ নদীর পানি আগুন হিসেবে দর্শিত হয়। সুতরাং একজন মানুষকে নদীর অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছু বললে তার ধারণা এবং দৈত্যের ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীতই হয়।

একইভাবে, ধরা যেতে পারে বস্তুর মায়ামরীচিকাময়তাকে। বস্তুকে বিদ্যমান অথবা অ-বিদ্যমান কোনটিই বলা যায় না।

অধিকন্তু এও বলা যাবে না যে, এই পৃথিবীতে উৎপন্ন এবং বিলয়ের পরে আরও একটি পৃথিবী আছে যা নশ্বর এবং সত্য। এরূপ ধারণা, পৃথিবী যে নশ্বর অথবা অবিনশ্বর এই সম্পর্কে ভুল ধারণার জন্ম দেয়।

এই পৃথিবীর অজ্ঞ মানুষেরা এটাকে প্রকৃত পৃথিবী হিসেবে গ্রহণ করে এবং স্বভাববশতঃ অন্যায় অযৌক্তিক কাজে অগ্রসর হয়। যেহেতু এই পৃথিবী শুধুমাত্র মায়ামরীচিকায় ভরা, সেহেতু মানুষেরা যা করে সবই এই ময়ামরীচিকতার ভিত্তিতেই করে; যা মানুষকে নৈতিক ক্ষতি এবং দুঃখের দিকে ধাবিত করে।

অন্যদিকে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি এগুলোকে ভালোভাবে বুঝেন এবং বাস্তবতাকে উপলব্ধি করেন, যথাযথ কর্ম সম্পাদন করেন এবং দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করেন।

৪

মধ্যম পথ

১। সংসার দুঃখ হতে মুক্তিকামীদের মধ্যে যারা পরম মুক্তির দিশারী তাদেরকে অবশ্যই দু'টি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে অতি সতর্কতার সাথে গ্রহণ করতে হবে। তাদের একটি হলো কাম তৃষ্ণাকে ত্যাগ করা এবং দ্বিতীয়টি হলো শীল বিনয়ের মাধ্যমে নিজের দেহ-মনকে সংবরণ করা।

চারি আর্যসত্য যা এ দু'টি সিদ্ধান্তকে অতিক্রম করেছে; যা মনকে পরম মুক্তির দিকে ধাবিত করে, এবং প্রজ্ঞা ও মানসিক প্রশান্তি লাভে সহযোগিতা করে তাকেই মধ্যম পথ বলা হয়। এ মধ্যম পথগুলো হলো ঃ (১) সম্যক দৃষ্টি, (২) সম্যক সংকল্প, (৩) সম্যক বাক্য, (৪) সম্যক কর্ম, (৫) সম্যক আজীব, (৬) সম্যক ব্যায়াম, (৭) সম্যক স্মৃতি ও (৮) সম্যক সমাধি।

উপরের বর্ণনানুসারে সমস্ত বস্তুর উপস্থিতি অথবা অনুপস্থিতি অসংখ্য কার্য-কারণ দ্বারাই সংগঠিত হয়ে আসছে। অজ্ঞ ব্যক্তিরা জীবনকে হয়ত অবিনশ্বর অথবা নশ্বর হিসেবে দর্শন করে থাকে। কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তিরা অবিনশ্বরতা এবং নশ্বরতা এ দু'য়ের উর্দ্ধেই জীবনকে নিয়ে ভাবার চেষ্টা করে। এভাবে ভাবাটাকেই মধ্যম পথ হিসেবে ধরা যায়।

২। ধরা যাক, একটি গাছের টুকরা নদীর পানিতে ভাসছে। যদি তা নদীর তলদেশে ডুবে না যায়; অথবা কারও দ্বারা নদী থেকে তুলে নেয়া না হয়; অথবা নদীর পানিতে নষ্ট না হয়; তাহলে তা অবশ্যই এক সময় সমুদ্রে পৌঁছাবেই। জীবন হলো বড় নদীর স্রোতের মধ্যে ধরা পড়া একটি গাছের টুকরার ন্যায়। যদি কোন ব্যক্তি নিজের আরাম আয়েশের প্রতি, অথবা মৃত্যুর প্রতি আসক্তিপরায়ণ না হয়, যদি কোন ব্যক্তি কৃচ্ছ্রসাধনের প্রতি আসক্তিপরায়ণ না হয়, যদি সে তার নিজের গুনাগুনের প্রতি আসক্তিপরায়ণ না হয়, যদি সে নিজের খারাপ কাজের প্রতি আসক্তিপরায়ণ না হয়, যদি সে মহামুক্তির অনুসন্ধানকারী হয়, তাহলে

মায়ামরীচিকাময় জাগতিক ঘৃন্যবস্তুর প্রতি আসক্তিপরায়ণ সে হবে না। অধিকন্তু, মায়ামরীচিকাময় জীবনের প্রতি ভীতি উৎপন্ন করবে। এভাবে যারা জীবন যাপন করে তারাই মধ্যম পথের অনুসারী।

মহামুক্তির পথযাত্রীদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যে কোন ধরনের আসক্তি এবং জটলা থেকে দূরে থাকা। তার অর্থ হলো জীবনে সর্বদা শান্ত, স্হির, সুশৃঙ্খল, অবিরাম কর্মমুখর মধ্যমপথ অনুসরণ করা।

বস্তুর বিদ্যমানতা অথবা অবিদ্যমানতা, সমস্ত কিছুর স্বরূপকে স্বপ্নের ন্যায় স্মরণ করিয়ে দেয়। মহামুক্তিকামীকে আপন অহংকার অথবা সৎ কাজের জন্য প্রশংসা অথবা অন্য যে কোন ঝামেলাপূর্ণ আসক্তি ত্যাগ করা উচিৎ।

যদি কোন ব্যক্তি তৃষ্ণার জাল হতে মুক্তি লাভ করতে চায় তাহলে তাকে প্রাথমিকভাবে অবশ্যই শিক্ষা করতে হবে যে, বস্তুর প্রতি আসক্তিপরায়ণ না হওয়া এবং এ অবস্হার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়েও আসক্তিগ্রস্হ না হওয়া। তাকে অবশ্যই বস্তুর অবিনশ্বরতা এবং নশ্বরতার আসক্তি হতে মুক্ত হতে হবে; মনের অথবা দেহের ভিতর অথবা বাহিরের যে কোন ধরনের আসক্তি হতে অবশ্যই মুক্ত হতে হবে।

যদি মন যে কোন বস্তুর প্রতি আসক্তিপরায়ণ হয়, ঠিক সে মুহূর্তেই মরীচিকাময় জীবন শুরু হয়। মহামুক্তির পথযাত্রী মানে যিনি আর্য্য পথ অনুসরণ করেন তিনি 'দুঃখ'কে প্রতিপালন করেন না; এমনকি 'প্রত্যাশা মূলক' ইচ্ছাকেও তিনি প্রতিপালন করেন না। কিন্তু তিনি নিরপেক্ষ এবং শান্ত মনের সাথে যা কিছু উৎপন্ন হয় তাকে সম্যক জ্ঞানে দর্শন করেন।

৩। সর্বজ্ঞতাজ্ঞানের কোন প্রকার আকার বা স্বরূপ নেই, যার দ্বারা তাকে মানুষের সম্মুখে স্পষ্টতঃভাবে প্রতীয়মান করা যায়। সুতরাং সর্বজ্ঞতাজ্ঞানকে সবিস্তারে বর্ণনা করার কিছুই নেই।

মোহ এবং অবিদ্যার কারণেই সর্বজ্ঞতাজ্ঞানের উপস্হিতি। যদি তাদের বিনাশ ঘটে

তাহলে সর্বজ্ঞতাজ্ঞান উপলব্ধি হয়। অপর পক্ষে, ইহাও সত্য যে, সর্বজ্ঞতাজ্ঞান ব্যতিরেকে মোহ এবং অবিদ্যাকে যেমন ভাবা যায় না, তেমনি মোহ এবং অবিদ্যাকে ব্যতিরেকে সর্বজ্ঞতাজ্ঞানকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

সুতরাং সর্বজ্ঞতাজ্ঞানকে বস্তু হিসেবে ভাবার ধারণা এবং একে আঁকড়িয়ে ধরার প্রবণতা সম্পর্কেও সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এগুলো মানসিক উৎকর্ষতা সাধনে বাঁধা স্বরূপ। যখন চিত্ত অন্ধকার হতে আলোর দিকে ধাবিত হয়, তখন উক্ত ধারণাগুলো দূরিভূত হয় এবং এর সাথে সাথে যাকে আমরা সর্বজ্ঞতাজ্ঞান বলি তাও অবস্হান্তরিত হয়।

যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষেরা সর্বজ্ঞতাজ্ঞানের প্রতি বাসনাপরায়ণ হয় এবং একে আঁকড়ে ধরে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত মোহ তাদের সাথে অবস্হান করে এরূপ বুঝতে হবে। অতএব, যারা মহামুক্তির পথযাত্রী তাদেরকে আসক্তি মুক্ত হতে হবে এবং যখন তারা সর্বজ্ঞতাজ্ঞান উপলব্ধি করবে তখন এ জ্ঞানের প্রতি আসক্তিপরায়ণ হয়ে অবস্হান করবে না।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে মুক্তিকামীরা যখন মুক্তির আস্বাদ পেয়ে থাকে তখন তারা নিজেরাই সমস্ত বস্তুর মাঝে মুক্তির সন্ধান খুঁজে পায়। সুতরাং মুক্তিকামীদেরকে মুক্তির পথ অনুসরণ করতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের চিন্তা-চেতনা, পার্থিব ধ্যান-ধারণা, এবং মহামুক্তি সম্বন্ধে স্ব-স্ব সংস্কার দ্বারা উৎপন্ন অবস্হাকে এক ও অভিন্ন রূপে দর্শন করার ক্ষমতা অর্জন না করে।

৪। বস্তুর এ পরমার্থিক অভিন্ন ধারণায়, এর এমন কোন অপরিহার্য্য বৈশিষ্ট্য নেই যে, কোন এক চিহ্নের মাধ্যমে তাকে স্বতন্ত্র করা যায়। একেই বলা হয় "বস্তুর শূন্যতাবাদ" যার অর্থ হলো সত্ত্বাহীন, জন্মহীন, আকার বিহীন এবং দ্বিত্বহীন। এর কারণ সত্ত্বার মধ্যে এমন কোন আকার বা বৈশিষ্ট্য নেই, যাকে আমরা বলতে পারি, এর জন্ম হচ্ছে অথবা মৃত্যু হচ্ছে। সত্ত্বার এমন কোন অপরিহার্য্য স্বভাব নেই, যাকে আমরা প্রভেদ করতে পারি, যার কারণে বস্তুকে সত্ত্বাহীন বলা হয়।

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, সমস্ত বস্তুর উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি কার্য্য-কারণ নিয়মেই সংগঠিত হচ্ছে। কোন কিছুই নিজে নিজে উৎপন্ন হচ্ছে না, কারণ এরা একে অপরের সাথে সম্পর্কিত।

যেখানে আলো আছে, সেখানে অন্ধকারও আছে। আবার যেখানে লম্বা কিছু আছে, সেখানে বেটে কিছুও আছে, এবং যেখানে সাদা আছে, সেখানে কালোও আছে। এরূপে বস্তুর স্বরূপ নিজে নিজে এককভাবে প্রতীয়মান হয় না বলেই তাকে সত্ত্বাহীন বলা হয়।

একইভাবে, সর্বজ্ঞতাজ্ঞান যেমন অবিদ্যা ব্যতীত প্রতীয়মান হয় না তেমনি আবার অবিদ্যা ব্যতীত সর্বজ্ঞতাজ্ঞানও উপলব্ধি করা দূরূহ। যে পর্যন্ত বস্তুর অপরিহার্য্য স্বভাবের মধ্যে প্রভেদ না ঘটে, সে পর্যন্ত সেখানে কোন দ্বিত্বতার স্হান নেই।

৫। সাধারণত মানুষেরা অভ্যাসগতভাবে ধারণা করে, জন্ম এবং মৃত্যু তাদের সাথে সম্পর্কিত, কিন্তু বাস্তবতার দিক থেকে এর কোন সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না।

যখন মানুষেরা এই সত্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়, তখন তারা জন্ম ও মৃত্যুর দ্বিত্বহীনতার বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারে।

এর কারণ হলো মানুষেরা সাধারণত অহংবোধকে প্রতিপালন করে আসছে; এবং এই অহংবোধ আপন মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কিন্তু মানুষের মধ্যে যদি এই অহংবোধের অবসান ঘটে, তাহলে মন আবরণ মুক্ত হয়। যখন মানুষ এই সত্যকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়, তখন তারা দ্বিত্বহীনতা তত্ত্বকে বুঝতে পারে।

মানুষেরা মনের মাঝে পবিত্র এবং অপবিত্র ভাবের প্রতিপালন করে; কিন্তু বস্তুর প্রকৃত স্বভাবের মাঝে এই ভাবের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। সাধারণত এই ভাব মানুষের ভুল এবং অযৌক্তিক ধারণাজাত।

মনস্তত্ত্ব ও বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ

এভাবে মানুষেরা ভাল এবং খারাপ এই দু'য়ের প্রভেদ করে। কিন্তু এই দু'টি আলাদা আলাদাভাবে অবস্হান করে না। যারা জ্ঞান সন্ধানের পথযাত্রী তাদের মাঝে দ্বিত্বতা বোধের কোন স্হান নেই। এই ভাব তাদেরকে সৎ কাজকে প্রশংসাও করতে বলে না, আবার অসৎ কাজকে নিন্দাও করতে বলে না; এমনকি ভালোকে অপ্রশংসাও করে না এবং খারাপকে ক্ষমাও করে না।

সাধারণত মানুষেরা দুর্ভাগ্যে আর্তনাদ করে এবং সৌভাগ্যে আনন্দিত হয়; কিন্তু যদি এই প্রভেদকে সতর্কতার সাথে ভাবা হয়, তাহলে দেখা যায় দুর্ভাগ্য প্রায় সময়েই সৌভাগ্যে পরিণত হয়, আর সৌভাগ্য পরিণত হয় দুর্ভাগ্যে। জ্ঞানীগণ এই পরিবর্তিত পরিস্হিতিকে নিরপেক্ষভাবে দর্শন করেন। তাই তারা সফলতায় গর্বিত যেমন হন না; বিফলতায় তেমনি মনভঙ্গও হন না। এরূপে বস্তুর দ্বিত্বহীনতা তত্ত্বকে উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

সুতরাং নিম্নে বর্ণিত শব্দগুলো দ্বিত্বতা সম্পর্কে ধারণা দিয়ে থাকে। যেমন- অবস্হান-অ-অবস্হান, পার্থিব কাম্যতা-নষ্কামতা, পবিত্রতা-অপবিত্রতা, ভাল-মন্দ, এই বৈষম্যমূলক পদগুলোর একটিও মানুষের মনে তাদের প্রকৃত স্বভাবের ধারণা বা উপলব্ধি জন্মাতে পারবে না। যখন মানুষেরা এই পদগুলোর বৈষম্যমূলক ধারণা থেকে মুক্ত হতে পারবে তখনই তারা বস্তুর শূন্যতা ধর্ম উপলব্ধি করবে এবং ইহাই 'চিরন্তন সত্য' বা 'শ্বাশ্বত সত্য'।

৬। সুরভিত পদ্ম যেমন উন্নত দোআঁশ মাটিতে প্রস্ফুটিত না হয়ে কর্দমাক্ত জলাভূমিতে প্রস্ফুটিত হয়, তদ্রুপ এ পৃথিবীর পার্থিব ভোগ বিলাসময় আবর্জনা থেকেই বুদ্ধের সর্বজ্ঞতাময় জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। এমনকি প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী ধারণা এবং পার্থিব ভোগ বিলাসের দ্বারা প্রতারিত হওয়াও বুদ্ধত্ব লাভের বীজ স্বরূপ হতে পারে।

যদি একজন নাবিক প্রবাল এবং বদমেজাজী হাঙ্গরের বিপদজনক আক্রমনকে উপেক্ষা করে মুক্তাকে রক্ষা করার জন্যে সমুদ্রের তলদেশে জাহাজ পরিচালনা

করতে পারে; তদ্রুপ মানুষকেও মহামূল্যবান মুক্তা স্বরূপ সর্বজ্ঞতাজ্ঞান অর্জনে এ পৃথিবীর পার্থিব ভোগ বিলাসময় বিপদ হতে মুক্ত হতে হবে। সর্বপ্রথম তাকে বন্ধুর ও দূরারূহ পর্বতচূড়াময় আত্মবাদ ও অহংবোধ থেকে মুক্ত হতে হবে। তবেই সে মুক্তির পথ দর্শন করতে পারবে; এবং যার মাধ্যমে সে জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হবে।

এখানে একজন সাধকের কাহিনী উল্লেখ করা যেতে পারে। একদা একজন সাধক যিনি সত্যপদ সন্ধানে অতীব উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন, তিনি একদা একটি খাড়া পাহাড়ের উপরে উঠে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন; যা তাঁর অভিষ্ঠ লাভের জন্যেই করেছেন। যিনি বা যাঁরা এরূপ ঝুঁকি ও বিপদজনক জেনেও এপথকে বেছে নেন, তিনি বা তাঁরা দ্বেষময় আগুনের মাঝেও খড়্গের ন্যায় খাড়া পাহাড়ের উপরে সুশীতল সমীরণের সন্ধান লাভ করেন। অবশেষে তিনি বা তাঁরা আত্মবাদ এবং পার্থিব ভোগ বিলাস যেগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন এবং যন্ত্রণাভোগ করেছিলেন সেগুলোর মধ্যেই জ্ঞানের সন্ধান লাভ করেন।

৭। বুদ্ধের শিক্ষা আমাদেরকে একই বস্তুর দু'টি পরস্পরবিরোধী ধারণার দ্বিত্বহীনতা শিক্ষা দিয়ে থাকে। একটি বস্তুর মাঝে সঠিক ও নির্ভুলের সন্ধান লাভ করা এবং পুনঃ একই বস্তুতে ভালো ও খারাপ প্রত্যক্ষ করা মানুষের ভুল ধারণা।

যদি মানুষেরা তৃষ্ণাবশতঃ দৃঢ়তাসহকারে বলে, সমস্ত বস্তু অনিত্য এবং অসার; পরিবর্তনহীন এবং শাশ্বত; এ ধারণাও মহাভুলের সমষ্টি মাত্র। যদি কেহ আত্মবাদে আসক্ত হয়ে পড়ে, ইহা তাকে অতৃপ্তির যন্ত্রণায় কষ্ট দেয়। যদি সে ধারণা করে যে, আত্মবাদের কোন অস্তিত্ব নেই, এ ধারণাও তাকে কষ্ট দেয় এবং সত্য পথের অনুশীলন তার জন্যে তখন অর্থহীন হয়ে পড়ে। যদি কেহ দাবী করে যে, জাগতিক সমস্ত কিছুই দুঃখময় ইহাও ভুল; আবার যদি বলে শান্তিময়; তাও ভুল। বুদ্ধ এ প্রতিকুল ধারণা বা সংস্কার উত্তরণের জন্যে মধ্যম পথের শিক্ষা দিয়েছেন; যেখানে দ্বিত্বতা একাত্বতার মাঝে প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

৩য় পরিচ্ছেদ

বুদ্ধের স্বরূপ

১

পরিশুদ্ধ মন

১। মানুষের মধ্যে নানা প্রকারের মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ বিদ্যমান। এর মধ্যে কেহ জ্ঞানী, কেহ অজ্ঞানী, কেহ ভালো স্বভাবের, কেহ খারাপ স্বভাবের, কেহ সহজ সরল, কেহ কুটিল-জটিল, কেহ পবিত্র মনের অধিকারী আবার কেহ নোংরা মনের। কিন্তু মনের এসকল ভিন্নতা জ্ঞান উপলব্ধির ফলে উপেক্ষনীয় হয়ে যায়। এ ধরা পদ্ম পুকুরের ন্যায়, যা নানা জাতের উদ্ভিদে পরিপূর্ণ; যেখানে নানা বর্ণের ফুল প্রস্ফুটিত হয়। এগুলোর মধ্যে কোন কোন ফুল সাদা, আবার কোন কোন ফুল বেগুনী; কোন কোন ফুল নীল, আবার কোন কোন ফুল হলুদ। কিছু কিছু ফুল পানির নীচে প্রস্ফূটিত হয়; আবার কিছু কিছু ফুল পানির মধ্যেই প্রস্ফূটিত হয়; কিছু কিছু ফুল আবার পানির উপরেই প্রস্ফূটিত হয়। মানব সমাজের মধ্যেও ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ছেলে-মেয়ে, স্বামী-স্ত্রী, যুবক-যুবতী যার ভিন্নতা অত্যাবশ্যকীয় নয়। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেলে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই জ্ঞান লাভে সক্ষম।

একটি হাতীর প্রশিক্ষক হতে হলে তাকে পাঁচটি গুনের অধিকারী হতে হয়। যেমন, ১। সুস্বাস্থ্যবান, ২। বিশ্বাসী, ৩। অধ্যবসায়ী, ৪। উদ্দেশ্যের প্রতি গভীর আগ্রহ এবং ৫। প্রাজ্ঞতা। বুদ্ধের জ্ঞান উপলব্ধির জন্যেও একই গুণাবলীর প্রয়োজন। যদি উক্ত গুণাবলীগুলো কারও মধ্যে নিহিত থাকে, তাহলে সে অবশ্যই জ্ঞান উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। বুদ্ধের ধর্ম শিক্ষা করতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় না; কারণ সকলের স্বভাবে বুদ্ধত্বজ্ঞান উপলব্ধির বীজ নিহিত রয়েছে।

২। জ্ঞান উপলব্ধির পথ অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষেরা নিজের চক্ষে বুদ্ধের দর্শন লাভ করে এবং নিজের মনের মধ্যে বুদ্ধের প্রতি বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। যে চোখের দ্বারা বুদ্ধকে দর্শন করে এবং যে মনের মধ্যে বুদ্ধের প্রতি বিশ্বাস উৎপন্ন হয় এ চোখ

এবং মন এক ও অভিন্ন, যা জন্ম-মৃত্যুর সময়েও এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়।

যদি একজন রাজা দস্যু দ্বারা উৎপাতের সম্মুখীন হন, তাহলে দস্যুদেরকে আক্রমনের পূর্বে তাদের অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত হতে হবে। একইভাবে, একজন ব্যক্তি যখন পার্থিব ভোগ-লালসায় আক্রান্ত হয়, তখন তাকে সর্বপ্রথমেই এগুলোর মূল সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

যখন একজন লোক ঘরের ভিতরে তার চোখ উন্মোচন করে, তখন সে ঘরের আভ্যন্তরীণ বস্তুগুলো দর্শন করে এবং পরে জানালার মাধ্যমে বাহিরের দৃশ্য দর্শন করে। ঠিক একইভাবে, বাহিরের বস্তু দর্শনের পূর্বে আমাদেরকে ঘরের ভিতরের বস্তু অর্থাৎ অর্ন্তজগতের বস্তুকে দর্শন করা প্রয়োজন।

যদি আমাদের শরীরের মধ্যে মনের অবস্থান থাকে; তাহলে প্রথমেই শরীরের ভিতরের অংশগুলো জানা প্রয়োজন। কিন্তু সাধারণত মানুষেরা বাহ্যিক বস্তুতেই আকৃষ্ট হয় বেশী এবং অর্ন্তঃজগতকে জানা বা যত্ন নেয়ার ব্যাপারে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে না।

যদি মন শরীরের বাহিরে থাকে, তাহলে শরীরের প্রয়োজনীয়তার সাথে মনের কোন সম্পর্ক না থাকার কথা। কিন্তু লক্ষ্য করা যায়, শরীরে যা অনুভূত হয় মন তা জানে আগে এবং মন যা জানে শরীরেও তা পরে অনুভূত হয়। সুতরাং বলা যাবে না যে, মন শরীরের বাহিরে অবস্থান করে। তাহলে প্রশ্ন জাগে মনের সত্ত্বা কোথায় অবস্থান করে ?

৩। সুদূর অজানা অতীত হতে মানুষেরা অবিদ্যা জনিত কর্ম সংস্কারের কারণে ২টি প্রধান মৌলিক ভুল ধারণার জন্যে ভ্রান্তপথে চালিত হয়ে আসছে।

এর প্রথমটি হলো, মানুষেরা বিশ্বাস করে যে প্রভেদীকরণ মন যা জন্ম-মৃত্যুর মূল, তাই তার আসল রূপ এবং দ্বিতীয়টি হলো, তারা জানে না যে, প্রভেদীকরণ মনের পশ্চাতে লুকায়িত একটি পুত পবিত্র মন রয়েছে, যা তার প্রকৃত স্বরূপ।

বুদ্ধের স্বরূপ

যখন একজন মানুষ হাত মুষ্টিবদ্ধ করে এবং বাহু উত্তোলন করে চোখ তা দর্শন করে এবং মন প্রভেদ করে। কিন্তু মনের এ প্রভেদীকরণ তার প্রকৃত রূপ নয়।

প্রভেদীকরণ মন শুধু প্রভেদই করে এবং কল্পনার মাধ্যমে বৈষম্যও করে; যার ফলে আকাংখাও মনের অন্যান্য অবস্হার সাথে আত্মবাদেরও সৃষ্টি হয়। প্রভেদীকরণ মনই হলো কার্য্য-কারণের মূল, এতে কোন সত্ত্বা নেই যা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু যখন থেকে মানুষেরা বিশ্বাস করে যে, এটিই মনের আসল রূপ, ঠিক তখন থেকেই কার্য্য-কারণের সাথে মোহ যুক্ত হয়ে দুঃখের সৃষ্টি করে।

একজন মানুষ যখন নিজের হাতের মুষ্টি খোলে, তখন মন তা উপলব্ধি করে। কিন্তু হাতের এ চালনা শক্তিটি কি ? একে কি মন, নাকি হাত বলা হবে ? অথবা দু'টির কোনটিই নয় ? যদি হাত নড়ে তাহলে মনও একইভাবে নড়ে এবং একইভাবে তদ্বিপরীতও করে। কিন্তু এ চলন মন শুধুমাত্র ভাসা ভাসা মনেরই অবস্হা। ইহা প্রকৃত বা প্রধান মন নয়।

৪। মৌলিক দিক থেকে প্রত্যেকে পবিত্র মনের (প্রভাস্বর চিত্তের) অধিকারী। কিন্তু ইহা সচরাচর পার্থিব ভোগ লালসার দ্বারা কলুষিত হয়, যা নিজের পারিপার্শ্বিকতা থেকে সৃষ্টি হয়। এ কলুষিত মন নিজের প্রকৃত অপরিহার্য্য মন নয়-এতে কিছু মিশ্রিত হয়ে আছে, যার প্রবেশের অধিকার নেই বা কোন একটি বাড়ীতে নিমন্ত্রণবিহীন অতিথির আগমন স্বরূপ।

চন্দ্র প্রায় সময় মেঘের মধ্যে লুকিয়ে থাকে কিন্তু ইহা কখনও মেঘের দ্বারা স্হান পরিবর্তন করে না এবং চন্দ্রের শুভ্রতারও কোন পরিবর্তন হয় না। অতএব, কলুষিত মনই 'প্রকৃত মন' মানুষের এ ভুল ধারণা পোষণ করা উচিৎ নয়।

এ ধারণা মনে রেখে সদা সতর্ক ও জাগ্রত মন নিয়ে প্রকৃত ও মৌলিক অপরিবর্তনীয় মনের মাধ্যমে সর্বজ্ঞতাজ্ঞান লাভে অগ্রসর হতে হবে। পরিবর্তনের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে, কলুষিত মন এবং বিকৃত ধ্যান-ধারণার দ্বারা ভ্রান্ত পথে চালিত হয়ে মানুষেরা এ পৃথিবীর মোহান্ধে নিমর্জ্জিত হয়ে ঘুরপাক খেতে থাকে।

পারিপার্শ্বিকতা পরিবর্তনের জন্যে লোভ এবং তার প্রতিক্রিয়া থেকে মানুষের মনে অশান্তি ও মলিনতার জন্ম নেয়।

যে মন নানা কিছু উৎপত্তির পরেও বিব্রতবোধ করে না, সর্বমুহূর্তে স্থির অবস্থায় অবস্থান করে, তাহাই প্রকৃত মন এবং এরূপ মন তৈরী করাই শ্রেয়।

যেমন, পান্থশালায় লোক না থাকায় পান্থশালা নেই এটা বলা যাবে না। তেমনি পারিপার্শ্বিকতা পরিবর্তনের জন্যে উৎপন্ন মলিন চিত্তের মাধ্যমে প্রকৃত চিত্ত বিলীন হয়েছে এটাও বলা যাবে না। ঐ পরিবর্তিত অবস্থা মনের প্রকৃত স্বরূপ নহে।

৫। ধরা যাক, একটি বক্তৃতা মঞ্চের কথা, যা সূর্যের আলোয় আলোকিত হয় এবং সূর্যের অস্তাগমনে অন্ধকার হয়ে যায়।

এতে আমরা ভাবতে পারি সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে আলোও চলে যায় এবং অন্ধকারের সাথে সাথে রাত্রির আগমন ঘটে। কিন্তু মনের উপলব্ধিজাত এই আলো এবং আঁধার আমরা ভাবতে পারি না। মন ঐ আলো এবং আধাঁর ধারণে সমর্থ যা অন্য কাউকেও ফিরিয়ে দেয়ার মত নয়। ইহা কেবল মাত্র মৌলিক সত্যকে বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে দেখা মাত্র।

সূর্য উদিত হওয়ার সময় আলোকিত হয় এবং অস্ত যাওয়ার সময় অন্ধকার নেমে আসে। এই পরিবর্তন ক্ষণিকের জন্যে মনে উৎপন্ন হয় মাত্র।

ক্ষণে ক্ষণে জীবন এবং পারিপার্শ্বিকতার পরিবর্তনের ফলে মনের মধ্যেও এই পরিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবর্তন মনের প্রকৃত রূপ নয়। আলো এবং আধাঁরকে উপলব্ধি করতে পারে এমন মনই প্রকৃত মন এবং ইহাই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ।

বাহ্যিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে ক্ষণিকের জন্যে মানুষেরা কুশল ও অকুশল, ভালো লাগা এবং মন্দ লাগা ইত্যাদি অনুভব করে। ক্ষণিকের প্রতিক্রিয়া থেকেই

এগুলো মানুষের মনে উৎপন্ন হয়; যার কারণ পুঞ্জিভূত আসক্তি।

তৃষ্ণা, বৈষয়িক আসক্তি যা মনকে ঘিরে অবস্হান করে এগুলোকে ত্যাগ করতে পারলেই মনের স্বচ্ছতা আসে এবং এটাই মনের প্রকৃত স্বরূপ।

পানি যে কোন একটি গোলাকার পাত্রের মধ্যে রাখলে গোলাকার দেখায় এবং বর্গাকার পাত্রের মধ্যে রাখলে বর্গাকৃতি দেখায়। কিন্তু পানির নিজের কোন সুনির্দিষ্ট আকার নেই। সাধারণত মানুষেরা এই সত্যকে ভুলে যায়।

মানুষেরা সচরাচর ইহা ভালো, ইহা খারাপ, এটি পছন্দ করি বা এটা পছন্দ করি না, এবং বস্তুর স্হায়ীত্ব ও অস্হায়ীত্বের মধ্যে পার্থক্য করে। যার ফলশ্রুতিতে তারা আসক্তির বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে যায় এবং পরিশেষে দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে থাকে।

যদি মানুষেরা কাল্পনিক এবং মিথ্যা ধারণাজাত এ বৈষম্যমূলক আসক্তি ত্যাগ করতে পারে এবং তাদের প্রকৃত স্বচ্ছ মন সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে তাদের শরীর ও মন আসক্তি ও দুঃখ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। এভাবে তারা বুঝতে পারে যে মনের প্রশান্তি এ মুক্তির মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

২
বুদ্ধের স্বরূপ

১। আমরা পূর্বেই পবিত্র ও প্রকৃত মনের বর্ণনা করেছি যা মনের মৌলিক অবস্হা। ইহাই বুদ্ধের স্বরূপ যা বুদ্ধাঙ্কুর সদৃশ।

সূর্যের আলোতে একটি ধাতব কাঁচ ধরলে তার মধ্য দিয়ে আগুন পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ঐ আগুনের উৎপত্তি স্হল কোথায় ? ধাতব কাঁচটি থেকে সূর্য অনেক অনেক দূরে; কিন্তু তবুও ঐ কাঁচের মাধ্যমে আগুনের আবির্ভাব ঘটে। আবার ধাতব

কাঁচটি যদি তীক্ষ্ণ প্রখরতা প্রাপ্ত না হয়, তাহলে আগুনের আবির্ভাব হয় না।

ঠিক একইভাবে যদি মানুষের চিত্তে বুদ্ধের জ্ঞান রূপ আলো সমাহিত হয়, (যার আসল রূপ বুদ্ধাঙ্কুর স্বরূপ এবং যার আলোকে আলোকিত হয় মানুষের মন এবং প্রকৃত শ্রদ্ধা জাগ্রত হয় বুদ্ধের প্রতি) বুদ্ধই তখন আলোকবর্তিকা হয়ে তাঁর জ্ঞানের আলো নিয়ে মানুষের সামনে উপস্থিত হন এবং তাদের শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করেন।

২। মানুষেরা সাধারণত নিজের প্রকৃত মনকে বুদ্ধের "সর্বজ্ঞতাজ্ঞান উপলব্ধি সমৃদ্ধ মন" থেকে ভিন্ন বলে ধারণা করে থাকে। এ ধারণা থেকে বৈষয়িক আসক্তির জন্ম নেয় এবং এ আসক্তি ভালো ও খারাপানুসারে মনের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করে। যার দরুন, অনুতাপের মাধ্যমে দুঃখ কষ্টে পতিত হয়।

মানুষেরা কেন এই স্বাভাবিক ও পুত-পবিত্র মনের অধিকারী হয়ে এখনও নিজেকে মায়ামরীচিকাময় জগতে, বুদ্ধাঙ্কুরকে আবৃত করে বুদ্ধ প্রজ্ঞা স্বরূপ আলোর সন্ধান না করে দুঃখ কষ্টের মধ্যে অবস্থান করছে ?

একদা এক ব্যক্তি আয়নার বিপরীতে তার চেহারা দেখতে চেষ্টা করলো। কিন্তু আয়নাতে তার চেহারা এবং মাথা দেখতে না পেয়ে পাগল হয়ে গেল। কি আশ্চর্য ! এভাবে সে পাগল না হলেও তো পারতো। এটা তার বোকামীতার জন্যেই হলো।

তদ্রুপ একজন বোকা লোকও দুঃখে নিমজ্জিত হয়; কারণ সে সর্বজ্ঞতাজ্ঞান উপলব্ধি করেনি। সর্বজ্ঞতাজ্ঞানের মধ্যে কোন ব্যর্থতা নেই; ব্যর্থতা আছে শুধু তাদের মধ্যে, যারা দীর্ঘ দিন ধরে তাদের মনের মধ্যে প্রতিনিয়ত প্রভেদীকরন দৃষ্টির মাধ্যমে সর্বজ্ঞতাজ্ঞানকে স্হান দিয়েছে। স্বচ্ছ মনের অনুপস্হিতি ও ধারণাজাত কারণে মনে লোভ এবং মায়ামরীচিকার উৎপত্তি হয় যা প্রকৃত মনকে আড়াল করে রাখে।

যদি পুঞ্জীভূত মিথ্যা ধারণা মানুষের মন থেকে অপসারণ করা যায় তাহলেই সর্বজ্ঞতাজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। কিন্তু ইহাও অস্বাভাবিক কিছু নয় যে, যখন কেহ

সর্বজ্ঞতাজ্ঞান উপলব্ধি করে থাকেন তখন তাঁরা অনুধাবন করতে পারেন যে, মিথ্যা ধারণা ব্যতিরেকে কোন সর্বজ্ঞতাজ্ঞানই নেই।

৩। বুদ্ধাঙ্কুর এমন কিছু নয় যার পরিসমাপ্তি আছে। যদিও মানুষ তাদের কর্মগুণে প্রাণীজগতে উৎপন্ন হয় অথবা ক্ষুধার্ত প্রেতলোকে উৎপন্ন হয় অথবা নরকে পতিত হয়; কিন্তু তবুও তারা বুদ্ধাঙ্কুর বিহীন নয়।

এই কলুষিত দেহ সমাধিস্থ হলেও, অথবা কামনা-বাসনার জগতে মোহগ্রস্থ হয়ে লুকায়িত অবস্থায় থাকলেও, বোধি লাভের সম্পর্ক হতে সম্পূর্ণ নির্বাসিত করা যায় না।

৪। সে অনেক দিন পূর্বের কথা। এটি মাদকাসক্ত অবস্থায় শায়িত এক বৃদ্ধের গল্প। বৃদ্ধলোকটির এক বন্ধু যতটুকু সম্ভব তার সংগী হলো। কিন্তু মাদকাসক্ত বৃদ্ধলোকটির বন্ধু তার ব্যবহার্য এক মূল্যবান বস্তু কোন কারণে লুকিয়ে রাখতে বাধ্য হলো; এ কারণে সে ভয়ে বৃদ্ধলোকটিকে ত্যাগ করে চলে গেল। মাদকাসক্ত বৃদ্ধলোকটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেও তার বন্ধু যে গতরাত মূল্যবান বস্তুটি লুকিয়ে রেখেছিল তা বুঝে উঠতে পারেনি। বৃদ্ধলোকটি অভাব এবং ক্ষুধার্ত অবস্থায় এদিক ওদিক ঘুরা ফেরা করছিল। অনেকদিন পর দু'জনে পুনঃ মিলিত হলে, পূর্বের ঘটনাটি প্রকাশ করলো এবং মূল্যবান বস্তুটি সন্ধান করতে উপদেশ দিল।

এই ভব সমুদ্রে মানুষেরা জন্ম এবং মৃত্যুর মাধ্যমে দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে ঘুরে বেড়ায়। তাদের অজ্ঞানতার বিপরীতে যে পূত পবিত্র এবং অমূল্য সম্পদ স্বরূপ বুদ্ধত্বের বীজ নিহিত রয়েছে তা তারা বুঝতে পারে না; তাই তারা দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে থাকে।

এভাবে অসতর্কতার দরুন তারা যতই অমর্যাদাপূর্ণ এবং অবিদিত কাজ করুক না কেন বুদ্ধ তাদের নিকট থেকে বিশ্বাস হারান না। কারণ তাদের মধ্যে সম্ভাবনাময় বুদ্ধাঙ্কুর নিহিত আছে।

বুদ্ধ, যারা অজ্ঞানতা দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়ে নিজের মধ্যে নিহিত বুদ্ধাঙ্কুর দর্শন করতে পারে না, তাদের মধ্যে আলোকবর্তিকা হয়ে উপস্থিত থেকে, তাদেরকে মোহের বেড়াজাল হতে বেড়িয়ে আসার পথ নির্দেশনা দেন এবং এও শিক্ষা দেন যে, তাদের সাথে বুদ্ধত্বের কোন প্রভেদ নেই।

৫। বুদ্ধ হলেন তিনিই যিনি জ্ঞান উপলব্ধি করেছেন। মানুষ হলো তারাই যারা বুদ্ধত্ব লাভে সক্ষম। এ দু'য়ের মাঝে ইহাই শুধু পার্থক্য।

কিন্তু একজন মানুষ যদি দাবী করে যে সে জ্ঞান অর্জন করেছে, তাহলে সে নিজেই নিজেকে প্রশংসা করছে। যদিও সে ঐ পথের পথিক, কিন্তু এখনও সে বুদ্ধত্বজ্ঞান অর্জনে সক্ষম হননি।

বুদ্ধের স্বরূপ অধ্যবসায়ী এবং নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছাড়া আর কারো কাছে আবির্ভূত হয় না এবং বুদ্ধত্বজ্ঞান অর্জন ছাড়া তিনি তাঁর অবস্হান থেকে চ্যুত হন না।

৬। এক সময় এক রাজা কিছু অন্ধ লোককে এক হাতীর সামনে হাজির করে, হাতী দেখতে কেমন তা জিজ্ঞাসা করলেন। একজন হাতীর দাঁত স্পর্শ করে বললো, 'হাতী দেখতে বৃহদাকার গাছের ন্যায়'; অন্যজন হাতীর কান স্পর্শ করে বললো, 'হাতী দেখতে বড় পাখার ন্যায়'; অন্য আরেকজন হস্তিশুঁড় স্পর্শ করে বললো, 'হাতী দেখতে মানুষের মত'। পুনঃ অন্য একজন হাতীর পা স্পর্শ করে বললো, 'হাতী দেখতে থমের ন্যায়'; আবার আরেকজন হাতীর লেজ ধরে বললো, 'হাতী দেখতে দড়ির ন্যায়'। তাদের একজনও হাতীর প্রকৃত স্বরূপ রাজাকে বলতে পারলো না।

একইভাবে, একজন মানুষের আংশিক স্বরূপ হয়তো বর্ণনা করা যেতে পারে, কিন্তু তার প্রকৃত স্বরূপ বা বুদ্ধের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা করা যায় না।

একটি মাত্র সম্ভাবনাময় পথ আছে, যার দ্বারা মানুষের চিরন্তন স্বভাব বা বুদ্ধের স্বরূপকে পরিপূর্ণভাবে বুঝা সম্ভব, তাহলো বুদ্ধ এবং বুদ্ধের শিক্ষাকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করা।

৩

অনাত্মা

১। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বুদ্ধের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, যা বর্ণনা করার মত ছিল। এখন যা অন্যান্য শিক্ষার ন্যায় অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা নয়, সে আত্মা নিয়ে আলোচনা করবো।

আমিত্বের ধারণা এমন একটি জিনিস যা মনের বৈষম্যমূলক আচরণের মাধ্যমে সৃষ্ট হয় এবং এর প্রতি মন রমিত হয়। কিন্তু মনের এ অবস্থা ত্যাগ করা উচিৎ। অপরদিকে, বুদ্ধের স্বরূপ এমন একটা অবস্থা যা আমরা বর্ণনা করতে অক্ষম; ইহা প্রথমে নিজেকেই আবিষ্কার করতে হবে। এক দৃষ্টিতে, একে আমরা আমিত্বের সাথে তুলনা করতে পারি কিন্তু ইহা 'আমি' ও 'আমার' এ অর্থে আমিত্ব নয়।

আত্মার স্থায়ীত্বকে বিশ্বাস করা ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। এ ধারণা অনাত্মাকে বিদ্যমানতা হিসেবে প্রতীয়মান করে, যা বুদ্ধের স্বরূপকে অর্থাৎ অনাত্মাকে আত্মা হিসেবে ভুল ধারণা দিয়ে থাকে।

ইহা একটি গল্পের মাধ্যমে বর্ণনা করা যেতে পারে। এক মা তার অসুস্থ্য শিশুকে ডাক্তারের নিকট নিয়ে গেলো। ডাক্তার শিশুকে দেখার পর ঔষধ দিয়ে তার মাকে বললেন, ''ঔষধ সেবনের পর যতক্ষণ পর্যন্ত তা হজম না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত যাতে স্তন্যপান না করান''।

মা তার স্তন্যে কিছু তিক্ত পদার্থ লেপন করে শিশুটিকে স্তন্য পানে বিরত রাখলো। অতঃপর ঔষধ হজম হওয়ার পরে মায়ের স্তন্য পরিস্কার করে ধৌত করার পর শিশুটিকে পান করতে দিলো। মায়ের এ পদ্ধতি তার স্নেহজাত। কারণ সে তার শিশুকে খুবই ভালবাসে।

উক্ত গল্পের মায়ের ন্যায় বুদ্ধ ভ্রান্ত ধারণা ও আত্মাবোধের আসক্তি থেকে মুক্তি

লাভের জন্যে আত্মাবোধের অস্হিত্বকে অস্বীকার করেছেন। যখন এ আত্মাবোধের ভ্রান্ত ধারণা দুরিভূত হবে তখনই প্রকৃত মনের সন্ধান পাওয়া যাবে; যা বুদ্ধের প্রকৃত স্বরূপ।

আত্মাবোধের আসক্তিগ্রস্ত ব্যক্তি মোহের দ্বারা পরিচালিত হয়, কিন্তু নিজের মধ্যে বুদ্ধের স্বরূপ নিহিত রয়েছে, এরূপ ধারণা মানুষকে সর্বজ্ঞতার দিকে নিয়ে যায়।

ইহা বর্ণিত গল্পের মহিলাটির ন্যায়, যে তার স্তন্য দান করেছিল। এ স্তন্য দানের মধ্যে যে স্বপ্ন লুপ্ত ছিল তা ঐ মা ছাড়া অন্য কেহ উপলব্ধি করতে পারবে না। তদ্রুপ বুদ্ধ মানুষের মনকে আলোকিত করেন এবং পবিত্র বুদ্ধের স্বরূপকে মানুষের সম্মুখে উপস্হাপন করেন।

২। প্রশ্ন করা যেতে পারে, যদি প্রতিটি মানুষের অন্তরে বুদ্ধের স্বরূপ নিহিত থাকে তাহলে কেন একে অপরকে প্রতারণা করে এবং দুঃখ দেয় ? কেনইবা মানুষে মানুষে খুনাখুনি করে ? আবার কেনই বা বিভিন্ন পদমর্যাদা, সম্পদ, ধনী এবং গরীবের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান ?

একজন মল্লযোদ্ধার গল্প এখানে উপস্হাপন করা যেতে পারে। মল্লযোদ্ধাটি সবসময় তার কপালে একটা মূল্যবান পাথর ব্যবহার করতো। একদা মল্লযুদ্ধ করার সময় তার কপালের মূল্যবান পাথরটি কপালের মাংসের সাথে মিশে গেল। এতে মল্লযোদ্ধাটি মনে করলো, তার মূল্যবান পাথরটি হারিয়ে গেল। তাই সে একজন শৈল্যচিকিৎসকের নিকট গিয়ে ক্ষত স্হানটি নিরাময়ের জন্য অনুরোধ জানালো। যখন শৈল্যচিকিৎসক তার ক্ষত স্হান নিরাময়ের জন্য আসলেন তখন দেখতে পেলেন যে, মূল্যবান পাথরটি কপালের মাংস এবং রক্তের দ্বারা আবৃত অবস্হায় আছে। ডাক্তার একটি আয়নার মাধ্যমে মল্লযোদ্ধাকে পাথরটি দেখালেন।

বুদ্ধের প্রকৃতি এ গল্পের মূল্যবান পাথর সদৃশ। বুদ্ধের বীজ সবার মাঝে নিহিত আছে, কিন্তু তা নানা আবর্জনার দ্বারা আবৃত। ফলে সাধারণ মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু একজন দক্ষ শিক্ষক তা উপলব্ধি করে সবাইকে দর্শন করাতে

সক্ষম।

প্রত্যেকের মাঝেই বুদ্ধের বীজ নিহিত আছে, তা যতই লোভ, দ্বেষ ও মোহের গভীরে থাকুক না কেন; অথবা নিজের কাজের দ্বারা বিলীন হয়ে যাকনা কেন। বুদ্ধাঙ্কুর কখনও বিলীন হওয়ার মত নয়। যখন সকল অজ্ঞানতা দুরিভূত হয়, তখন পুনঃ বুদ্ধাঙ্কুর আবির্ভূত হয়।

উপরের গল্পে মাংস এবং রক্তের মাঝে মিশ্রিত হয়ে যেমন মূল্যবান পাথরটি লুকায়িত ছিল-যা আয়নার দ্বারা প্রদর্শিত হয়েছিল; তদ্রুপ মানুষের পার্থিব কামনা-বাসনার আড়ালে বুদ্ধাঙ্কুর নিহিত রয়েছে-যা বুদ্ধের জ্ঞানালোকের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়।

৩। আমাদের চারিপাশে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ থাকলেও বুদ্ধাঙ্কুর সদা পবিত্র এবং স্নিগ্ধময়। গাভীর রং লাল, সাদা এবং কালো হলেও দুধ কিন্তু সর্বদা সাদাই হয়ে থাকে; তেমনি মানুষেরা তাদের চিন্তা এবং কাজে যাই করুক না কেন বুদ্ধাঙ্কুর কিন্তু সর্বদা অপরিবর্তনীয়।

ভারতের একটি রূপকথায় দেখা যায় যে, হিমালয়ের পাদদেশে দীর্ঘ ঘাসের দ্বারা আবৃত অবস্থায় কিছু রহস্যপূর্ণ বনজ ঔষধ ছিল। দীর্ঘদিন ধরে অনেকে চেষ্টা করে ও তার অনুসন্ধান পেলো না। কিন্তু অবশেষে একদিন এক বিজ্ঞ ব্যক্তি আস্বাদের মাধ্যমে তার সন্ধান খুঁজে বের করলেন। বিজ্ঞ লোকটি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন ঔষধ সংগ্রহ করে একটি টিউবের ভেতর রাখতেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর অন্য কেহই আর ঐ পর্বত হতে বনজ ঔষধ সংগ্রহ করতে পারল না। এদিকে টিউবের মধ্যে রক্ষিত ঔষধগুলোও ধীরে ধীরে অম্লযুক্ত হওয়ায় সেবনের অনুপযুক্ত হলো।

একইভাবে বুদ্ধাঙ্কুর সবার তীব্র পার্থিব কামনা বাসনার মাঝেই লুকায়িত অবস্থায় আছে যা সহজে অনুমান করা যায় না। কিন্তু বুদ্ধ ইহা প্রথমে নিজে দর্শন করেছেন এবং পরে তা অন্যকেও দৃষ্টিগোচর করিয়েছেন-যা বিভিন্ন জন বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের

মাধ্যমে উপলব্ধি করেছেন।

৪। হীরক হলো বস্তুর মধ্যে সবচেয়ে শক্ত। একে সহজে ভাংগা যায় না। বালি অথবা পাথরকে সহজেই পাউডারের ন্যায় গুড়া করা যেতে পারে; কিন্তু হীরাকে তা করা কষ্টকর। বুদ্ধাঙ্কুরও তদ্রুপ; একে সহজে নষ্ট করা যায় না।

মানুষের স্বরূপ-মানে শরীর এবং মন দু'টোই বিচ্ছিন্ন হতে পারে, কিন্তু বুদ্ধাঙ্কুর বিচ্ছিন্ন হওয়ার মত নয়। বুদ্ধাঙ্কুর হলো মানুষের জ্ঞানের উৎকর্ষতার সবচেয়ে উৎকৃষ্টাংশ। বুদ্ধ বলেছেন, "মানুষের স্বরূপের মধ্যে স্ত্রী, পুরুষ ইত্যাদির প্রভেদ থাকলেও বুদ্ধাঙ্কুরের মাঝে এর কোন প্রভেদ দেখা যায় না"।

খাঁটি স্বর্ণ পেতে হলে যেমন আকরিকের মাধ্যমে গলিয়ে অন্য পদার্থগুলোকে পৃথক করা হয়, তদ্রুপ মানুষেরা তাদের মনকে পার্থিব কামনা-বাসনার হাত থেকে এবং আমিত্ববাদের হাত থেকে পৃথক করতে পারে। এভাবে তারাও পবিত্র বুদ্ধাঙ্কুরের দর্শন লাভ করতে পারে।

৪র্থ পরিচ্ছেদ
কলুষিত পথ

১
মানবীয় কলুষিত পথ

১। এ পৃথিবীতে ২টি পার্থিব আবেগ আছে। এগুলোর দ্বারা পবিত্র বুদ্ধের স্বরূপ কলুষিত এবং অদৃশ্য হয়ে যায়।

প্রথমটি হলো, বিশ্লেষণ এবং আলোচনাধর্মী যার দ্বারা সাধারণ মানুষ কোন কিছু সিদ্ধান্ত নিতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। এবং দ্বিতীয়টি হলো, ভাবাবেগ জনিত অভিজ্ঞতা যার দ্বারা সাধারণত মানুষের শ্রদ্ধাবোধের মধ্যে বিভ্রান্তির জন্ম দেয়।

সকল মানুষের কলুষিত চিন্তাকে আমরা দু'ভাবে লক্ষ্য করি। একটি হলো, আসক্তি এবং অন্যটি হলো, আসক্তির মাধ্যমে কোন কিছু করা। কিন্তু এর মূলে দু'টি আদি পার্থিব অবস্হার বিদ্যমানতা লক্ষ্য করা যায়। এদের একটি হলো অজ্ঞানতা এবং অন্যটি হলো তৃষ্ণা।

আসক্তির কারণ নির্ভর করে অজ্ঞানতার মাঝে এবং আসক্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে কিছু করা নির্ভর করে তৃষ্ণার মাঝে। সুতরাং লক্ষ্য করা যায় যে, এ দু'টিই আসলে একটি এবং এরা একত্রে সকল দুঃখের কারণও বটে।

যদি কোন ব্যক্তি অজ্ঞানতার মাঝে অবস্হান করে তাহলে সে কোন সময়েই সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে না। তার ভব তৃষ্ণা, লোলুপতা, কোন কিছুকে আঠার মত আঁকড়িয়ে ধরা এবং সবকিছুর মধ্যে আসক্তিপরায়ণ হয়ে বাস করাটা স্বাভাবিক। দর্শনে ও শ্রবণে এরূপ লাগামহীন আকাংখা মানুষকে মোহগ্রস্ত করে তোলে। এতে অনেকে তাদের দেহচ্যুতিও কামনা করে থাকে।

এরূপ প্রাথমিক উৎস হতেই সকল প্রকার লোভ, দ্বেষ, মোহ, ভুল বুঝাবুঝি, অসন্তুষ্টি, ঈর্ষা, তোষামোদ, প্রতারণা, অহংকার, ঘৃণা, প্রমত্ততা ও স্বার্থপরতা ইত্যাদি উৎপন্ন হয়।

২। লোভের উৎপত্তি হয় ভুল ধারণাজাত পাওয়ার ইচ্ছা, উপভোগের ইচ্ছা ইত্যাদি সন্তুষ্টি হতে; দ্বেষের উৎপত্তি হয় নিজের অহংবোধ এবং পারিপার্শ্বিক প্রতিকুলতা-জাত ভুল ধারণা হতে এবং মোহের উৎপত্তি হয় কোনটি সঠিক তা নির্ধারনে অক্ষম-তার দরুন।

লোভ, দ্বেষ এবং মোহ এ তিনটিকে পৃথিবীর আগুন বলা হয়। যারা লোভের দ্বারা আক্রান্ত, তারা লোভের আগুনে দ্বগ্ধ হয়; যারা দ্বেষের দ্বারা আক্রান্ত, তারা দ্বেষের আগুনে দ্বগ্ধ হয়; আবার যারা মোহের দ্বারা আক্রান্ত হয়, তারা মোহের আগুনে দ্বগ্ধ হয়। কারণ তারা বুদ্ধের শিক্ষা শ্রবণ এবং চর্চা করে না।

এরূপে এ বিশ্ব নানা আকারে, নানা প্রকারের আগুনের দ্বারা দ্বগ্ধ হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এ আগুন হলো, লোভ আগুন, দ্বেষ আগুন, মোহ আগুন, বুদ্ধি ভ্রষ্ট ও আমিত্বের আগুন, জ্বরা-জীর্ণতার আগুন, অসুস্হতা ও মৃত্যুর আগুন, দুঃখ দায়ক আগুন, আর্তনাদ করার আগুন ও নিদারুন অশান্তি যন্ত্রণার আগুন ইত্যাদি অন্যতম। জীবনের প্রায় প্রতিটি মুহূর্তে এ আগুন কোন না কোন ভাবে জ্বালাতন করছে। এ আগুন শুধু নিজেকে ধ্বংস করছে না; অন্যের দুঃখের কারণও হচ্ছে, এবং তাদেরকে শরীর, মন এবং বাক্যের দ্বারা খারাপ কাজেও প্রভাবিত করছে। এ আগুনের দ্বারা আক্রান্ত ক্ষতস্হানে সংক্রামক বিষাক্ত পূঁজ হয়, এবং ক্রমে সমস্ত মন ও শরীরকে আক্রান্ত করে। অন্য যারা এ আগুনের নিকটবর্তী হয়, তারাও এ আক্রমণের স্বীকার হয় এবং বিপথগামী হয়।

৩। তৃপ্তির চাহিদা থেকে লোভের উৎপত্তি, অতৃপ্তি থেকে দ্বেষের উৎপত্তি এবং মোহের উৎপত্তি হয় অকুশল চিন্তা থেকে। লোভের মধ্যে কিছুটা অকুশল জড়িত থাকে যা সহজে ত্যাগ করা যায় না। আবার দ্বেষের মাঝে অনেক অকুশল জড়িত থাকলেও তা সহজেই ত্যাগ করা যায়। মোহের মাঝে সবচেয়ে বেশী অকুশল নিহিত

থাকে যা ত্যাগ করা অতীব কঠিন ব্যাপার।

অতএব, এ আগুন মানুষের মনে যখন যেভাবেই উৎপন্ন হউক না কেন সঠিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে, অতৃপ্তিকে তৃপ্তির মাধ্যমে এবং বুদ্ধের মৈত্রী, করুণার শিক্ষা দ্বারা এগুলোকে ত্যাগ করা প্রয়োজন। যদি মন প্রজ্ঞা, পবিত্রতা এবং অহংকার হীনতার দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে; তাহলে মনে পার্থিব ভোগ বিলাসের কোন স্থান থাকবে না।

৪। লোভ, দ্বেষ এবং মোহ মানুষের শরীরে জ্বরের ন্যায় কাজ করে। যদি কেহ এ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে নিজের বাড়ীতে কিছু না করেই অবস্থান করে, তাহলে অনিদ্রা জনিত কারণে সে নিদারুন যন্ত্রণা ভোগ করবে।

আর যারা এ জ্বরে আক্রান্ত হয়নি তারা সমস্যাবিহীনভাবে সুখে ঘুমাতে পারে, তারা তীব্র শীতের রাতে পাতলা পাতার দ্বারা আবৃত ঘরে অথবা তীব্র গরমের রাতে ছোট্ট ঘরেও মহাসুখে নিদ্রায়িত হয়।

অতএব, লোভ, দ্বেষ ও মোহ এ তিনটি মানুষের সর্ব দুঃখের মূল। এ দুঃখের মূল উৎপাটন করতে হলে অবশ্যই সকলকে শীল, সমাধি এবং প্রজ্ঞার চর্চা করতে হবে। শীল অনুশীলনের মাধ্যমে লোভের পরিসমাপ্তি হয়, সম্যক সমাধির মাধ্যমে দ্বেষের পরিসমাপ্তি হয় এবং প্রজ্ঞার উৎপত্তির মাধ্যমে মোহের পরিসমাপ্তি হয়ে থাকে।

৫। মানুষের তৃষ্ণা অফুরন্ত। ইহা তৃষ্ণার্ত মানুষের লবণাক্ত জল সেবনের ন্যায়; যা তৃষিতের তৃপ্তিদানে অক্ষম এবং যা তৃষ্ণাকে শুধু বাড়িয়েই দেয়।

সুতরাং যারা এ তৃষ্ণাকে চরিতার্থ করতে আগ্রহী, তারাই শুধু অতৃপ্তির মহাসাগরে পতিত হয় এবং তাদের দুঃখ দুর্দশা দ্বিগুনাকারে বর্ধিত হয়।

তৃষ্ণার চরিতার্থকরন কখনও তৃপ্তিদায়ক নয়; যার পশ্চাতে সর্বদা চঞ্চলতা ও অস্বস্তিকর অবস্হা বিরাজ করে। এমনকি তাকে সহজে উপশমও করা যায় না।

আবার যদি কেহ সে তৃষ্ণার চরিতার্থকরণে কোন বাঁধার সম্মুখিন হয়, তাহলে এ বাঁধা তাকে উন্মাদ পাগলের ন্যায় করে তোলে।

তৃষ্ণাকে চরিতার্থ করার জন্যে মানুষেরা শত প্রতিকুলতার মধ্যেও একে অন্যের সাথে ঝগড়া করছে, রাজায় রাজায় দ্বন্ধ বাঁধছে, প্রজায় প্রজায় দ্বন্ধ বাঁধছে, পিতা-মাতার সাথে ছেলে-মেয়েদের দ্বন্ধ, ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্ধ, বোনে বোনে দ্বন্ধ, বন্ধুতে বন্ধুতে দ্বন্ধ লেগেই আছে। এমনকি নিজের তৃষ্ণাকে চরিতার্থ করার জন্যে একে অপরকে হত্যা করতেও দ্বিধা বোধ করে না।

মানুষেরা নিজেদের তৃষ্ণাকে চরিতার্থ করার জন্যে এমনকি নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কুন্ঠাবোধ করে না। তারা চুরি, প্রতারণা ও ব্যভিচার করে এবং অভিযুক্ত হয়, ফলে অনুতপ্ত হয় ও অপকর্মের জন্যে শাস্তি ভোগ করে।

তারা নিজেদের শরীর, মন এবং বাক্যের দ্বারা অকুশল উৎপন্ন করে। তাদের সঠিকভাবে জানা উচিৎ যে, এ অকুশলজাত তৃষ্ণার চরিতার্থকরণ কেবল অশান্তি ও দুঃখই সৃষ্টি করে ও মনকে অপবিত্র করে এবং বিভিন্ন প্রকার শারীরিক ও মানসিক দুঃখ কষ্ট মানুষকে এ পৃথিবীতে যেমন ভোগ করতে হয়, তেমনি মৃত্যুর পরেও তা তাকে অনুসরণ করে।

৬। পার্থিব যত প্রকার আসক্তি আছে তাদের মধ্যে লোভই হলো সর্বপ্রধান। অন্যান্য সব আসক্তি লোভের দ্বারাই পরিচালিত হয়।

লোভ মাটির ন্যায় এবং অন্যান্য আসক্তি মাটির দ্বারা প্রচুর পরিমাণে বর্ধিত হয়। লোভ পিশাচের ন্যায়, যা এ পৃথিবীর সকল মূল্যবান বস্তু ভক্ষণ করে ফেলে। লোভ ফুলের আড়ালে লুকিয়ে থাকা বিষধর সর্পের ন্যায়, যা সৌন্দর্য অনুসন্ধানকারীকে দংশন করে। লোভ দ্রাক্ষালতার ন্যায় গাছের শাখা প্রশাখা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে; যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ গাছটি শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় মৃত্যুবরণ না করে। যতক্ষণ পর্যন্ত মন নির্জীব না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত লোভ কৌশলে মানুষের অনুভূতি নামক নরম অংশটিকে আঁকড়ে ধরে এবং মনের সকল উত্তম ধারণাগুলো ধ্বংস করে দেয়।

কলুষিত পথ

লোভ হলো অশুভ দৈত্যের বড়শির টোপ বিশেষ; যাতে অদূরদর্শী লোকেরা ধরা পড়ে এবং ফলশ্রুতিতে বিষম নরক যন্ত্রণা ভোগ করে।

যদি কোন একটি হাড় রক্তের প্রলেপে আবৃত থাকে, তাহলে তা কুকুর চিবাবে; যতক্ষণ পর্যন্ত না কুকুরটি পরিশ্রান্ত না হয় এবং নৈরাশ্য না হয়। তদ্রুপ লোভও যে কোন ব্যক্তির জন্যে ঐ কুকুরের হাড় চিবানোর ন্যায় যতক্ষণ পর্যন্ত না সে এই ব্যগ্র লালসা সম্পূর্ণ রূপে চরিতার্থ করতে পারবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত এতে অনুরক্ত থাকবে।

যদি দু'টো হিংস্র প্রাণীর সম্মুখে একটি মাংসের টুকরা ছুঁড়ে ফেলা হয় তাহলে তাদের মধ্যে তীব্র হিংস্রতার দ্বারা ঝগড়া বাঁধবে এবং তীক্ষ্ণ নখের মাধ্যমে মাংসের টুকরাটি নিজের বাগে আনার চেষ্টা করবে। একজন মানুষও তার বোকামির দ্বারা বায়ুর প্রতিকূলে মশাল ধরে নিজেকে দ্বন্ধ করে। এ দু'টি হিংস্র প্রাণী এবং বোকা মানুষটির ন্যায় সাধারণত আমরাও নিজেদেরকে ব্যথিত করি এবং পার্থিব আসক্তির মাধ্যমে প্রতিনিয়ত দ্বন্ধ হই।

৭। বাহিরের বিষাক্ত তীরের আক্রমন থেকে যদিও নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব, কিন্তু নিজের মনের ভেতর সৃষ্ট বিষাক্ত তীরের আক্রমন থেকে নিজেকে রক্ষা করা বড়ই কঠিন। লোভ, দ্বেষ, মোহ ও আমিত্বের দ্বারা বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে কাজ করা মানে, বিষাক্ত তীরের দ্বারা বিদ্ধ হয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হওয়া।

যদি মানুষ লোভ, দ্বেষ এবং মোহের দ্বারা আক্রান্ত হয়, মিথ্যা বলে, প্রতারণা করে, অপব্যবহার করে এবং এক মুখে দু'কথা বলে তাহলে তারা হত্যা, চুরি এবং ব্যভিচারের মাধ্যমে তাদের আসল রূপ প্রকাশ করে।

মনের দ্বারা তিন প্রকার অকুশল, বাক্যের দ্বারা চার প্রকার অকুশল এবং শরীরের দ্বারা তিন প্রকার অকুশল কর্ম সর্বমোট এই ১০ (দশ) প্রকার অকুশল কর্মের মাধ্যমেই অকুশল কর্মের সৃষ্টি।

যদি মানুষেরা মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত হয়, তাহলে তারা মনের অজান্তেই সব সময়ে মিথ্যা বলে থাকে। তারা দুর্নীতিপরায়ণ হওয়ার পূর্বেই মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত এবং যখন থেকে তারা মিথ্যা বলতে শুরু করে, তখন থেকে তারা নির্বিকারভাবে দুর্নীতিপরায়ণ হয়।

লোভ, লালসা, ভয়, রাগ, দুর্ভাগ্য এবং অসুখী অবস্হা সবই মোহ থেকে উৎপত্তি। অতএব, এ মোহই বিষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট।

৮। তৃষ্ণা হতে কাজ করার ইচ্ছা, আবার বিভিন্ন কাজ থেকে দুঃখের সৃষ্টি। কাজেই তৃষ্ণা, কাজ এবং দুঃখ চাকার ন্যায় অনন্ত কাল ধরে এ সংসারে ঘুরপাক খাচ্ছে।

ঘুরন্ত অবস্হায় চাকার শুরু যেমন দেখা যায় না, তেমনি শেষও দেখা যায় না। জন্মান্তরেও মানুষ তার সন্ধান পাবে না। পুনঃজন্মের নিয়মানুসারে এক জন্ম থেকে অন্য জন্মে এভাবে অনাদি অনন্তকাল ধরে চললেও তার পরিসমাপ্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না। যদি কেহ এ ধরাধামে তার জন্মান্তরের ভষ্মিত ছাই এবং হাড়গুলো কোথাও স্তুপাকারে রক্ষা করতো, তাহলে তা পর্বত সমান উঁচু হতো। আবার যদি কেহ পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে, যে পরিমাণ মাতৃ দুগ্ধ পান করেছিল তা সংগ্রহ করে রাখতো, তাহলে তাও গভীরতম সমুদ্রের জলের চেয়েও বেশী হতো।

যদিও সবার মাঝে বুদ্ধাঙ্কুর নিহিত আছে, কিন্তু ইহা পার্থিব আসক্তির গভীরে অবস্হান করার দরুন দীর্ঘদিন ধরে এর সন্ধান কেহই পায়নি। এই কারণেই মানুষেরা দুঃখ যন্ত্রণা অনিবার্য্যভাবে ভোগ করে আসছে এবং দুর্দশাগ্রস্হ জীবনের পরিসমাপ্তিও খুঁজে পাচ্ছে না।

কিন্তু আমরা যদি লোভ, দ্বেষ ও মোহের নিকট আত্মসমর্পন করি; তাহলে এ গুলোর দ্বারা অকুশল কর্মের সৃষ্টি হবে, যা পুনঃজন্মের হেতু হিসেবে কাজ করবে। সুতরাং বুদ্ধের প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে অকুশল কর্মের সমস্ত শিখর উৎপাটন করতে হবে এবং দুঃখের সংসারে পুনঃজন্ম রোধ করতে হবে।

২
মানুষের প্রকৃতি বা স্বরূপ

১। মানুষের প্রকৃতি বা স্বরূপ ঘন ঝোঁপের ন্যায়; যেখানে প্রবেশ করার কোন পথ নেই এবং যাকে বুঝা খুবই কঠিন। যদি আমরা পশুর সাথে তুলনা করি তাহলে পশুর প্রকৃতি বা স্বভাব বুঝা অনেকটা সহজতর। তবুও সাধারণত মানুষের প্রকৃতিকে বা স্বভাবকে ৪ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ কিছু মানুষ আছে যারা মিথ্যা দৃষ্টির দরুন কঠোর ব্রত পালন করে; যার দরুন কষ্ট ভোগ করে। দ্বিতীয়তঃ কিছু মানুষ আছে যারা নির্দয়তার দ্বারা, চুরির দ্বারা, হত্যার দ্বারা অথবা অন্য অমানবিক কাজের দ্বারা অপরকে কষ্ট দিয়ে থাকে। তৃতীয়তঃ কিছু মানুষ আছে যারা নিজেদের সাথে অন্যদেরকেও কষ্ট ভোগ করতে বাধ্য করে। চতুর্থতঃ আবার এমন কিছু মানুষ আছে নিজেরা কষ্ট ভোগ করলেও অন্যকে কষ্ট ভোগ করা থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করে। বুদ্ধের শিক্ষানুসারে এ শেষোক্ত লোকেরাই লোভ, দ্বেষ ও মোহের বাহিরে অবস্থান করে এবং মৈত্রী ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে হত্যা এবং চুরি করা থেকে বিরত থেকে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করে থাকে।

২। এ পৃথিবীতে তিন প্রকারের মানুষ আছে। প্রথমতঃ যারা পাথরের উপর খোদাই করা বর্ণের ন্যায়; তারা সহজেই রাগ এবং রাগজাত চিন্তা পাথরের উপর খোদাই করা বর্ণমালার ন্যায় তাদের মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না। দ্বিতীয় প্রকারের মানুষেরা হলো বালুর উপর লিখিত বর্ণের ন্যায়। যদিও তাদের মনে রাগ থাকে, সে রাগ বালির ন্যায় ক্ষণভংগুর হয়। তৃতীয় প্রকারের মানুষেরা হলো চলন্ত পানির উপর লিখিত বর্ণের ন্যায়; যারা সাধারণত গত হতে চলেছে এমন কিছুকে ধরে রাখে না, অপব্যবহার এবং অস্বস্তিপূর্ণ গল্পগুজবে মনোযোগী হয় না। তাদের মন সবসময় পবিত্র ও শান্তিপূর্ণ অবস্থায় অবস্থান করে থাকে।

আবার ভিন্ন তিন প্রকারের মানুষ দেখা যায়। এদের প্রথমটি হলো, অহংকারী,

যারা তাড়াহুড়ার মধ্যে কাজ করে এবং তারা কখনও সন্তুষ্ট হতে পারে না। তাদেরকে খুব সহজেই বুঝা যায়। দ্বিতীয়টি হলো, তারা সাধারণত বিনয়ী এবং বিবেচনার মাধ্যমে কাজ করে থাকে। আবার তাদের স্বভাব বুঝতে কষ্ট হয়। তৃতীয় প্রকারের লোক, যারা তৃষ্ণাকে অতিক্রম করেছে। তাদেরকেও বুঝা খুবই কষ্টকর।

এভাবে মানুষকে বিভিন্নরূপে শ্রেনীবদ্ধ করা যায়। কিন্তু তাদের স্বভাব বুঝা খুবই কষ্টকর ব্যাপার। কেবল মাত্র বুদ্ধই তাদেরকে বুঝতে সক্ষম এবং তাঁর প্রজ্ঞা দ্বারা বিভিন্ন শিক্ষার মাধ্যমে তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে পারেন।

৩
মানব জীবন

১। মানব জীবন নিয়ে একটি রূপক কাহিনী আছে, যেখানে তার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। একদা এক ব্যক্তি নদীতে নৌকার দাঁড় টানছিল। নদীর পাড় থেকে কোন একজন লোক তাকে বিপদের সংকেত দিয়ে বললো, "দ্রুতগতিতে নৌকা চালানো বন্ধ কর; অনতিদূরে জলপ্রপাত আছে এবং একটি বিপদজনক ঘূর্ণিস্রোত আছে। ঐখানে কিছু কুমির ও দৈত্য পাথরের খাদের মধ্যে অপেক্ষা করছে। তুমি দ্রুতগতিতে নৌকা চালানো অব্যাহত রাখলে প্রান হারানোর ভয় আছে।"

এ রূপক কাহিনীর "দ্রুতগতি" হলো জীবনের ভোগ-লালসা; "দ্রুতগতিতে দাঁড় টানা" মানে আবেগের লাগামহীনতা স্বরূপ; "জলপ্রপাত" মানে দুঃখ-যন্ত্রণা অত্যাসন্ন; "ঘূর্ণি স্রোত" মানে কামনাসক্ত এবং "কুমির ও দৈত্য" মানে জীবনাবসানের কথা উপস্হাপন করা হয়েছে, যা ভোগ-লালসা এবং অসংযমতার দ্বারা সৃষ্ট। "নদীর পাড়ের একজন" মানে তিনি স্বয়ং বুদ্ধ।

এখানে অন্য একটি রূপক কাহিনী উপস্হাপন করা যাক। এক অপরাধী লোক

ছুটাছুটি করছে যা কয়েকজন প্রহরী লক্ষ্য করলো। সে নিজেকে লুকানোর জন্য একটি কূপে নেমে পড়লো, যেখানে দ্রাক্ষালতার ঝোঁপ ছিল। সে কূপে নামার পরে দেখলো যে, কূপের তলদেশে এক বিষধর সর্প। তাই সে দ্রাক্ষালতার সাহায্যে নিজেকে রক্ষা করার জন্যে উপরে উঠার চেষ্টা করলো। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল তার বাহু দুর্বল হয়ে আসছে। সে মুহূর্তে দেখা গেল দু'টো ইঁদুর। এদের একটি সাদা অন্যটি কালো। ইঁদুরগুলো দ্রাক্ষালতা চিবিয়ে খাচ্ছে।

এমতাবস্হায় দ্রাক্ষালতা যদি ছিঁড়ে পড়ে তাহলে সে বিষধর সর্পের উপর গিয়ে পড়বে এবং এতে তার জীবন শেষ হবে। হঠাৎ উপরের দিকে তাকাতেই সে একটি মধু পোকার বাসা দেখলো, যেখান থেকে মাঝে মাঝে এক ফোঁটা আধ ফোঁটা করে মধু ঝরে পড়ছে। লোকটি তার সমস্ত বিপদের কথা ভুলে গিয়ে আনন্দের সাথে মধু পান করতেছিল।

এখানে "এক জন মানুষ" মানে যে একা জন্মগ্রহণ করে, একা মৃত্যুবরণ করে, তার কথাই বলা হয়েছে। "প্রহরী" এবং "বিষধর সর্প" মানে শরীরের সকল প্রকার তৃষ্ণাকে বুঝানো হয়েছে। "দ্রাক্ষালতা" মানে বহমান জীবনের কথা বলা হয়েছে। "সাদা এবং কালো দু'টি ইঁদুর" দ্বারা দিন-রাত এবং সময় ক্ষেপনের কথাকে বুঝানো হয়েছে। "মধু" মানে জীবনের আনন্দময় অবস্হার কথা বুঝানো হয়েছে; যা বছরের পর বছর মানুষকে দুঃখ-কষ্টের দ্বারা প্রতারিত করে আসছে।

২। এখানে আরও একটি রূপক কাহিনী বর্ণনা করা যাক। এক রাজা ৪টি বিষধর সাপ একই বাক্সের মাঝে রেখে, তাঁর একজন চাকরকে এদের রক্ষনাবেক্ষণের কাজে নিয়োগ করলেন। রাজা সাপগুলোকে যথাযথ যত্ন করতে বললেন এবং তাকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন যে, সে যদি কোন একটা সাপের সাথে রাগ করে তাহলে তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে। এ কথা শুনে চাকরটি ভয়ে বাক্সটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল।

রাজা ৫জন পাহারাদার পাঠিয়ে তাকে ধরার ব্যবস্হা করলেন। পাহারাদারগণ তাকে খুঁজে বের করে, প্রথমে বন্ধু সুলভ আচরণ করে, তার নিকটবর্তী হলেন এবং

তাকে নিরাপদে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যেতে চাইলো। কিন্তু চাকরটি তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণে বিশ্বাস স্হাপন করতে না পেরে অন্য একটি গ্রামে পালিয়ে গেল।

হঠাৎ একদিন সে গায়েবী শব্দ শুনতে পেল যে, ঐ গ্রাম তার জন্যে নিরাপদ নয়। এও জানলো যে ঐ গ্রামে ৬জন জলদস্যু বাসা বেঁধে অবস্হান করছে এবং তাকে আক্রমন করার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। সুতরাং সে ভয়ে দৌঁড়ে ঐ গ্রাম ছাড়লো এবং গভীর এক নদীর ধারে এসে পৌঁছালো যেখানে তার যাত্রা বন্ধ হলো। সে কিছুক্ষণ পর বিপদের কথা মনে করলো। অবশেষে সে একটি ভেলা তৈরী করে প্রচন্ড বিক্ষোভপূর্ণ নদী পার হয়ে নিজের নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ স্হানে পৌঁছাল।

এ গল্পের "চারি বিষধর সাপ" মানে চারি মহাভূত-মাটি, পানি, আগুন ও বাতাস যার দ্বারা এ দেহ গঠিত। এ দেহ ও মন ভোগ লালসার দ্বারা তাড়িত হয়। সুতরাং মন শরীর থেকে বের হয়ে সর্বদা বাহিরে দৌঁড়াতে চেষ্টা করে।

"পাঁচজন পাহারাদার" যারা বন্ধুসুলভ কপটতায় তার নিকট এসেছিল, তারা হলো, পঞ্চস্কন্ধ, রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান-যার দ্বারা এ দেহ ও মন গঠিত।

"নিরাপদ বাসস্হান" মানে ষড়ায়তন, যা আসলে নিরাপদ নয়; এবং "৬ জন দস্যু" মানে ষড়ায়তনের ৬টি উদ্দেশ্য। অতএব, যখন সে ষড়ায়তন দ্বারা বিপদ অনুভব করলো তখন দৌড়ে অন্য একটি স্হানে গিয়ে পৌঁছালো; যেখানে প্রচন্ড বিক্ষোভপূর্ণ নদীর স্রোত ছিল। ঐ স্রোত এখানে পার্থিব আসক্তিরই বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করা হচ্ছে। অতএব, সে নিজেকে বুদ্ধের শিক্ষার মাধ্যমে ভেলা তৈরী করে প্রচন্ড বিক্ষোভপূর্ণ নদী পার হয়ে নিরাপদ স্হানে গমন করলো।

৩। এ পৃথিবীতে ৩ প্রকার বিপদাবস্হায় সন্তানেরা মাকে এবং মা সন্তানদেরকে সাহায্য করতে পারে না। এগুলো হলোঃ অগ্নিকান্ড, জলোচ্ছাস এবং সিদ কাটিয়ে চুরির সময়ে। যদিও এ বিপদ এবং দুঃসময়ে একে অপরকে সাহায্য করতে পারে না তবুও সহযোগিতা করার মত একটি সুযোগ থাকে।

কলুষিত পথ

কিন্তু ৩ প্রকার সময়ে মা সন্তানদেরকে এবং সন্তানেরা মাকে সাহায্য করতে পারে না। এগুলো হলো ঃ অসুস্হতার সময়, বয়োঃ বার্ধক্যতার সময় এবং মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্হায়।

মা যখন বয়োঃবৃদ্ধ হন তখন সন্তানেরা কিভাবে তাঁকে এই বার্ধক্যতা হতে মুক্ত করতে পারে ? আবার সন্তানেরা যখন অসুস্হ হয় তখন মা কিভাবে সন্তানের এই রোগ না হওয়ার নিশ্চয়তা দিতে পারেন ? অথবা যে কোন একজন যখন মৃত্যুর সম্মুখিন তখন অন্যজন কিভাবে তার মরণকে রোধ করবে ? এ অবস্হায় যে যতই একে অপরকে ভালবাসুক না কেন অথবা তাদের সম্পর্ক যতই গভীর হউক না কেন, কেহই কাকেও প্রকৃত পক্ষে সাহায্য করতে পারে না।

৪। এক সময় নরকের পৌরাণিক রাজা য্যামা অকুশল কর্মের ফলে নরকে পতিত এক লোককে জিজ্ঞাসা করলেন যে, জীবিত অবস্হায় সে কোন দিন ৩ জন স্বর্গের দূতকে দর্শন করেছিল কি ? লোকটি প্রত্যুত্তরে বললো, "না প্রভু ! আমি কোনদিন এরূপ কারও সাক্ষাত পাইনি।"

তখন য্যামা রাজা আবার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কোন দিন বয়সের ভারে নুয়ে পড়ে লাঠিতে ভার দিয়ে চলাফেরা করে এরূপ কোন মানুষকে দর্শন করেছো কি ? তখন লোকটি বললো, "হ্যাঁ প্রভু ! এরূপ লোক আমি প্রায় সময় দর্শন করতাম।" অতঃপর য্যামা রাজা তাকে বললেন, "তুমি বর্তমানে সেই অপরাধের শাস্তি হিসেবে এ কষ্ট ভোগ করছো। কারণ তুমি যখন ঐ বৃদ্ধ লোকটিকে দর্শন করেছিলে, তখন তাকে স্বর্গের দূত হিসেবে দর্শন করে, নিজেরও একই পরিণতির কথা যদি ভাবতে, তাহলে আজ তোমার এরূপ কষ্টভোগ করতে হত না।"

য্যামা রাজা পুনঃ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কোনদিন গরীব রোগী এবং অসহায় মানুষ দর্শন করেছ কি ?" লোকটি বললো, "হ্যাঁ প্রভু ! আমি এরূপ অনেক লোক দর্শন করেছি।" তখন য্যামা রাজা তাকে বললেন, "তুমি তাদেরকে স্বর্গের দূত হিসেবে দর্শন করোনি, যা তোমাকে সতর্ক করার জন্যে পাঠানো হয়েছিল।"

য্যামা রাজা লোকটিকে আরো একটি প্রশ্ন করলেন, "তুমি কোন দিন মৃত্যু দর্শন করেছ কি ? লোকটি বললো, "হ্যাঁ প্রভু ! অনেকবার দর্শন করেছিলাম এবং আমি নিজেও অনেকবার মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছিলাম।" য্যামা রাজা বললেন, "তুমি মৃত্যুকে স্বর্গের দূত হিসেবে মনে করোনি, করলে তোমার চিন্তা ধারার মাঝে পরিবর্তন আসতো এবং আজ নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হতো না।"

৫। একদা এক গ্রামে কৃশা গৌতমী নামের এক যুবতী তার ধনকুবের স্বামীর সাথে বাস করতো। সে তার পুত্রহারা হয়ে শোকে পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল। সে মৃত পুত্রকে নিয়ে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে তার মৃত পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা চাইলো।

অবশ্য কেহই এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে পারলো না। অবশেষে বুদ্ধের এক অনুসারী তাকে বুদ্ধের দর্শন করতে বললো। সে সময়ে বুদ্ধ জেতবনে অবস্হান করছিলেন। মহিলাটি তার পুত্রের মৃত দেহটিকে নিয়ে বুদ্ধের সম্মুখে উপস্হিত হলো।

তখন বুদ্ধ করুণাময় দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এ মৃত শিশুটিকে প্রাণ দান করতে আমার কিছু সরিষার বীজ প্রয়োজন; তুমি ৪/৫টি সরিষার বীজ আন। বীজগুলো অবশ্যই এমন বাড়ী থেকে আনবে যে বাড়ীতে কোন দিন মৃত্যু আগমন করেনি।"

অতঃপর কৃশা গৌতমী মৃত্যু হয়নি এমন বাড়ী খুঁজতে লাগলো। কিন্তু মৃত্যু হয়নি এমন বাড়ী সে একটিও খুঁজে বের করতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত সে বুদ্ধের নিকট গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলো। কিছুক্ষণ শান্ত থাকার পরে, সে নিজেই বুদ্ধের কথা উপলব্ধি করতে পারলো যে, জীবিতের মরণ নিশ্চিত। তখন সে মৃত দেহটিকে নিয়ে সমাধিস্হ করে, বুদ্ধের নিকট দীক্ষিত হয়ে তাঁর শিষ্যা হলো।

৪

মানব জীবনের বাস্তবতা

১। এ পৃথিবীর মানুষ অহংকার প্রবণ এবং সমবেদনাহীন। তারা একে অপরকে ভালবাসতে এবং সম্মান করতে জানে না। তারা তুচ্ছ ব্যপার নিয়ে তর্ক করে এবং ঝগড়া করে। ফলশ্রুতিতে নিজের ক্ষতি করে, কষ্টভোগ করে এবং জীবন অসুখী ও বিষন্ন করে তোলে।

মানুষ ধনী হউক বা দরিদ্রই হউক তারা সবসময়েই অর্থলিপসু হয়। কেহ বা দারিদ্রতার জন্যে, আবার কেহবা প্রাচুর্য্যতার কারণেই দুঃখ ভোগ করে থাকে। কারণ তাদের জীবন পরিচালিত হচ্ছে লোভের দ্বারা, তারা কখনও সন্তুষ্টতা লাভের চেষ্টা করে না।

ধনীলোক সবসময় তার ভূ-সম্পত্তি নিয়ে দুঃচিন্তায় থাকে। সে তার বৃহৎ বাসভবন এবং অন্যান্য সব সম্পত্তির ব্যাপারে চিন্তিত থাকে। সে আকস্মিক দুর্ঘটনায় পড়তে পারে, এমন দুঃশ্চিন্তাও তার থাকতে পারে। যেমন তার বৃহৎ বাসভবনে অগ্নিকান্ড ঘটতে পারে, ডাকাতি হতে পারে, এমনকি স্বয়ং তাকেও অপহরণ করে নিয়ে যেতে পারে ইত্যাদি। সে মৃত্যু এবং সম্পত্তির স্থানান্তরের কথা ভেবেও কষ্ট পান। অথচ মৃত্যুর সময় সে একাই মৃত্যুবরণ করে এবং কিছুই সে সাথে নিয়ে যেতে পারে না।

অপর দিকে, একজন দরিদ্রলোক সবসময় অপ্রতুলতায় ভোগে এবং অসংখ্য তৃষ্ণার জন্ম দেয়। যেমন ভূসম্পত্তি এবং বাড়ীঘর। সে ব্যগ্র লালসার দ্বারা তাড়িত হয়ে শরীর ও মনকে বহ্নিমান করে এবং মধ্যবয়সে মৃত্যু বরণ করে।

সমস্ত পৃথিবীকে সে নরক হিসেবে দর্শন করে। যদিও সে দীর্ঘদিন জীবিত ছিল, কিন্তু মৃত্যুর সময়েও সে একা মৃত্যুবরণ করে এবং কেহই তার পাশে থাকে না।

২। এ পৃথিবীতে ৫টি অকুশল কর্ম আছে। প্রথমটি হলো, নির্দয়তা-যা সমস্ত প্রাণীর

মধ্যেই আছে এবং যার দ্বারা একে অপরকে কষ্ট দেয়। সবল দুর্বলকে আঘাত করে, দুর্বলেরা সবলকে প্রতারণা করে। এভাবে প্রায় সকল জায়গায় দ্বন্ধ এবং নির্দয়তা চিরন্তন হয়ে বিরাজ করছে।

দ্বিতীয়টি হলো, পিতা-পুত্র, বড় এবং ছোট, স্বামী ও স্ত্রী, বয়োজৈষ্ঠ্য আত্মীয় এবং কনিষ্ঠের মধ্যে অধিকারের কোন সুনির্দিষ্ট নিশ্চয়তা নেই। প্রায় সময়েই দেখা যায় যে, প্রত্যেকেই শুধু নিজের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সুযোগ সুবিধার কথাই ভেবে থাকে। তারা একে অন্যকে প্রতারণা করে এবং তাদের মধ্যে আন্তরিকতার অভাব লক্ষ্য করা যায়।

তৃতীয়টি হলো, পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের আচরণ কিরূপ হওয়া উচিৎ এ ব্যাপারে তেমন কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। প্রায় সকলেই সময়ে অকুশল কাম চিন্তার দ্বারা তাড়িত হয়ে এমন কিছু করে বসে, যা তাকে মানুষের প্রশ্নের সম্মুখিন হতে হয়; যা প্রায়ই তর্ক, ঝগড়া, অবিচার এবং বিদ্বেষভাবের সৃষ্টি করে।

চতুর্থটি হলো, মানুষেরা সাধারণত একে অন্যের অধিকারকে সম্মান করে না। তারা নিজেদের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে, কিন্তু অপরের প্রয়োজনীয়তাকে সেভাবে চিন্তা করে না। তাদের এরূপ মনোভাব অন্যকে অশালীন বাক্য প্রয়োগ, প্রতারণা, মিথ্যা অপবাদ এবং অপব্যবহার করতে সহায়তা করে।

পঞ্চমটি হলো, মানুষেরা সাধারণত অপরের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের অবহেলা করে। তারা সবসময় নিজেদের আরাম-আয়েশের কথা এবং তাদের তৃষ্ণাকে চরিতার্থ করার কথাই ভাবে। তারা যে সাহায্য পেয়েছিল তা ভুলে যায় এবং অপরের বিরক্তির কারণও তারা বুঝতে চায় না, যা মহা অবিচারের নামান্তরও বটে।

৩। মানুষকে বুঝতে হবে, একে অপরের প্রতি আরও বেশী সহানুভূতিশীল হওয়া উচিৎ। তাদের উচিৎ একে অপরকে সম্মান করা, ভাল কাজের প্রশংসা করা এবং বিপদের সময়ে একে অপরকে সহযোগিতা করা। কিন্তু বিপরীতে তারা স্বার্থপর

এবং কর্কশভাষী হিসেবে প্রতীয়মান হয়। তারা একে অপরের অনুপস্থিতিতে অবজ্ঞা করে এবং উন্নতিতে ঈর্ষাপরায়ণ হয়। সময়ে এ বিরূপতা সাধারণত খারাপের দিকে মোড় নেয় এবং সহ্যের বাহিরে চলে যায়।

ঘৃণার এই অনুভূতি হিংস্রতার মাধ্যমে কোন কিছু করলেও শেষ হয় না। এই বিষাক্ত অনুভূতি মানুষের জীবনে ঘৃণা ও রাগের জন্ম দেয়, যা মনের গভীরে দাগ কাটে। ফলে, ইহা মানুষকে সংসারাবর্তে পুনঃজন্ম লাভে সহায়তা করে থাকে।

ইহা সত্য যে, এই পৃথিবীতে মানুষ একা জন্মগ্রহণ করে এবং একা মৃত্যুবরণ করে। কেহই তার আপন কর্মের ফল এড়াতে পারে না। ইহা ইহজগতেই হোক বা পরজগতেই হোক।

কার্য্য-কারণ নীতি চিরন্তন সত্য। প্রত্যেকেরই নিজেদের পাপের বোঝা নিজেদেরকেই বহন করতে হবে এবং অবশ্যই নিজেকে এর ফল ভোগ করতে হবে। একইভাবে কুশল কর্ম মানুষকে কুশল ফল দিয়ে থাকে; সহানুভূতি ও ভালবাসাপূর্ণ সুখী জীবন হচ্ছে এই সুখময় কুশলের ফসল স্বরূপ।

৪। সময় যখন গত হয়, তখন মানুষেরা বুঝতে পারে যে কিভাবে তারা লোভের দ্বারা বঞ্চিত, অভ্যাসের দ্বারা পরিচালিত হয়ে দুঃখ ভোগ করছে। ফলে, তারা নিজেকে অসহায় ও যে কোন কাজে নিরুৎসাহবোধ করে। প্রায় কাজে নিরুৎসাহের কারণে তারা একে অন্যকে দোষারোপ করে, পরস্পরের সাথে ঝগড়া করে পাপের গভীরতায় তলিয়ে যায়, সৎ পথে অগ্রসর হওয়া থেকে পিছিয়ে পড়ে এবং পাপের পঙ্কিলতার মধ্যে অল্প বয়সেই জড়িয়ে পড়ে, আমৃত্যু দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে। এভাবে তারা স্বর্গীয় জীবন যাপনের আশা ছেড়ে দিয়ে দুঃখ যন্ত্রণায় দিনযাপন করতে থাকে। এমনকি অকুশল কর্মের ফলে তাদেরকে এ পৃথিবীতে এবং মৃত্যুর পরে অপর জগতেও দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

ইহা অবশ্যই সত্য যে এই জীবনের সমস্ত কিছুই নশ্বর এবং অনিশ্চয়তায়

পরিপূর্ণ। এই সত্যটি উপলব্ধি না করাও অনুতাপের বিষয়। মানুষেরা সাধারণত সর্বদা আনন্দ ও তৃপ্তি সাধনেই ব্যস্ত।

৫। দুঃখে ভরপুর এই পৃথিবীতে ইহা স্বাভাবিক যে সকলেই আত্মকেন্দ্রীকতা এবং স্বার্থপরতার কথাই ভাবে। ফলশ্রুতিতে সকলেই সমভাবে দুঃখ-যন্ত্রণা ও দুর্দশাগ্রস্ত হয়।

মানুষেরা সাধারণত নিজের কথাই ভাবে অপরের কথা তেমন ভাবে না। তারা নিজেদের তৃষ্ণাকে কামনা ও লালসার দ্বারা তাড়িত হয়ে অকুশল কর্ম সম্পাদনে সহায়তা করে। এ কারণেও তাদেরকে অফুরন্ত কষ্ট ভোগ করতে হয়।

আরাম-আয়েশ ক্ষণস্থায়ী। ইহা সহজেই অতিক্রান্ত হয়। এ পৃথিবীর কিছুই চিরজীবন ভোগের নয়।

৬। সুতরাং মানুষের উচিৎ যখন তারা সমর্থবান এবং সুস্হাস্হ্যের অধিকারী, তখন পৃথিবীর পার্থিব ভোগ-লালসায় আকৃষ্ট না হয়ে গভীর আন্তরিকতার সাথে জ্ঞানানুসন্ধানী হওয়া; যার বাহিরে সুখের প্রকৃত আস্বাদ লাভ মোটেই সম্ভব নয়।

বেশীরভাগ লোকেরা এখনও অবিশ্বাস করে অথবা জানে না কার্য্য-কারণ নীতি কি ? তারা তাদের লোভ এবং অহংকারকে স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়। তারা আবার এও ধরে নেয় যে, ভালো কাজ সুখ বয়ে আনে এবং খারাপ কাজের দরুন দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়। তারা আন্তরিকভাবে এও বিশ্বাস করে না যে, এই পার্থিব জগতে যা কিছু করা হচ্ছে তার ফল ভবিষ্যতে ভোগ করতে হবে এবং এরই ফলশ্রুতিতে, পুণ্যবান ব্যক্তি পুরস্কৃত হবে এবং পাপী ব্যক্তি শাস্তি ভোগ করবে।

তারা তাদের বর্তমান কর্মের মর্মার্থ অনুধাবন করে না এবং বর্তমানের দুঃখ যন্ত্রণা যে তাদের দ্বারা সৃষ্ট এ ধারণাও ভুলে গিয়ে শুধু অনুতাপ করে এবং কান্নাকাটি করে থাকে। তারা শুধু বর্তমানের আশা-আকাংখা এবং দুঃখ-যন্ত্রণার কথাই ভাবে।

কলুষিত পথ

এই পৃথিবীতে স্থায়ী বলতে কিছুই নেই। সব কিছুই ক্ষণিক ও পরিবর্তনশীল এবং অকল্পনীয়। কিন্তু মানুষেরা অজ্ঞ এবং মোহ গ্রস্ত। ফলশ্রুতিতে, তারা কেবল মাত্র বর্তমানের আকাংখা এবং দুঃখ-যন্ত্রণাকে নিয়েই চিন্তা করে থাকে। তারা সঠিক শিক্ষাকে গ্রহণ করে না এবং তা উপলব্ধি করার চেষ্টাও করে না। তারা শুধু বর্তমানের ভোগ-লালসাযুক্ত চাহিদা এবং সম্পদের প্রতিই আকৃষ্ট।

৭। অনন্তকাল ধরে এই মোহময় এবং যন্ত্রণাময় পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব হয় এবং এখনও পর্যন্ত আবির্ভূত হচ্ছে। ইহা সত্যিই সৌভাগ্যের ব্যাপার যে, এখনও পর্যন্ত এ ধরাধামে বুদ্ধের ধর্ম শিক্ষা বিদ্যমান, যা মানুষেরা অনুসরণ করে উপকৃত হতে পারে।

এজন্যে সবাইকে গভীরভাবে চিন্তা করে মনকে সর্বদা লোভ, দ্বেষ ও মোহমুক্ত অবস্থায় এবং শরীরকেও এসব থেকে দূরে রেখে কুশল কর্মে নিয়োজিত রাখা প্রয়োজন।

সৌভাগ্যবশতঃ আমরা বুদ্ধের দর্শনের সন্ধান লাভ করেছি এবং এর প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রেখে ভবিষ্যতে আমরাও যাতে বুদ্ধত্বজ্ঞানের অধিকারী হতে পারি এরূপ প্রচেষ্টা থাকা প্রয়োজন। বুদ্ধের শিক্ষাকে অন্তর দিয়ে জানলে আমরা অন্যান্য তৃষ্ণা ও পাপময় পথ অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকবো এবং তাঁর শিক্ষাকে নিজে অনুসরণ করে অপরকেও অনুসরণে উৎসাহিত করতে পারবো।

৫ম পরিচ্ছেদ
বুদ্ধের দ্বারা নির্দেশিত মুক্তির পথ

১
অমিতাভ বুদ্ধের প্রার্থনা

১। পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে যে মানুষেরা সচরাচর পার্থিব ভোগ-বিলাসের দ্বারা তাড়িত হয়ে পাপের উপর পাপ করে যাচ্ছে। এতে তারা অসহ্য যন্ত্রণায় দিনাতিপাত করছে। নিজের জ্ঞান শক্তির মাধ্যমে তৃষ্ণা এবং অসংযমতার যাঁতাকল থেকে বের হয়ে আসতে পারছে না। যদি তারা পার্থিব এ ভোগ বিলাস থেকে বের হয়ে আসতে না পারে তাহলে কিভাবে তারা নিজের মাঝে লুকায়িত বুদ্ধের স্বরূপ বুঝতে পারবে ?

বুদ্ধ মানুষের স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করে, তাঁর মহা করুণা দৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের কল্যাণের জন্যে সব কিছুই শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তিনি কঠোর সাধনা করে মানুষের ভয় এবং দুঃখমুক্তির পথ আবিস্কার করেছেন। এ মুক্তির পথ অনুসন্ধানে তিনি নিজেকে বোধিসত্ত্ব রূপে অনাদি অনন্তকাল ধরে এ ধরাধামে আত্মপ্রকাশ করেছেন এবং তাঁর পারমি সম্ভার পূর্ণতার সাধনাকালে নিম্নোক্ত ১০টি প্রার্থনা করে গেছেন ঃ

(ক) "যদিও আমি বুদ্ধত্বজ্ঞান উপলব্ধির সাধনা করছি, কিন্তু আমি পরিপূর্ণতা অর্জন করবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত না এ ধরার সকলেই সর্বজ্ঞতা বা বুদ্ধত্বজ্ঞান উপলব্ধি না করে।"

(খ) "যদিও আমি বুদ্ধত্বজ্ঞান উপলব্ধির সাধনা করছি, কিন্তু ততদিন আমি পরিপূর্ণতা অর্জন করবো না, যতদিন পর্যন্ত আমার জ্ঞানের আলো সমগ্র পৃথিবীতে পৌঁছাবে না।"

বুদ্ধের দ্বারা নির্দেশিত মুক্তির পথ

(গ) "যদিও আমি বুদ্ধত্বজ্ঞান উপলব্ধির সাধনা করছি, কিন্তু ততদিন আমি পরিপূর্ণতা অর্জন করবো না, যতদিন পর্যন্ত না আমার প্রাণবায়ু থাকবে ততদিন পর্যন্ত আমি মানুষকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করাবো।"

(ঘ) "যদিও আমি বুদ্ধত্বজ্ঞান উপলব্ধির সাধনা করছি, কিন্তু ততদিন আমি পরিপূর্ণতা অর্জন করবো না, যতদিন পর্যন্ত দশ দিকের বুদ্ধের ন্যায় একত্রে আমার নামও উচ্চারিত হবে না।"

(ঙ) "যদিও আমি বুদ্ধত্বজ্ঞান উপলব্ধির সাধনা করছি, কিন্তু আমি পরিপূর্ণতা অর্জন ততদিন করবো না, যতদিন পর্যন্ত এই পৃথিবীর মানুষেরা আন্তরিকতার সাথে ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আমার পথনির্দেশিকা অনুসরণ করে আমার রাজ্যে জন্মাবে না।"

(চ) "যদিও আমি বুদ্ধত্বজ্ঞান উপলব্ধির সাধনা করছি, কিন্তু ততদিন আমি পরিপূর্ণতা অর্জন করবো না, যতদিন পর্যন্ত না প্রায় সব জায়গার মানুষেরা সর্বজ্ঞতাজ্ঞান উপলব্ধি করতে পারবে না, কুশল কর্ম সম্পাদন করবে না এবং আমার রাজ্যে জন্মগ্রহণ করবে না। তখন আমি তাদের মৃত্যুর পূর্বক্ষণে অসংখ্য বোধিসত্ত্বকে সাথে নিয়ে উপস্থিত হয়ে আমার রাজ্যে তাদেরকে স্বাগত জানাবো।"

(ছ) "যদিও আমি বুদ্ধত্বজ্ঞান উপলব্ধির সাধনা করছি, কিন্তু ততদিন আমি পরিপূর্ণতা অর্জন করবো না, যতদিন পর্যন্ত না মানুষেরা সর্বস্থানে আমার শিক্ষা সম্পর্কে জানবে না, আমার রাজ্য সম্পর্কে ভাববে না, আমার রাজ্যে উৎপন্ন হওয়ার কথা চিন্তা করবে না এবং শেষ পর্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তাদের সকল আশা-আকাংখা পরিপূরণে সহায়ক স্বরূপ কুশল কর্মবীজ বপন করবে না।"

(জ) "যদিও আমি বুদ্ধত্বজ্ঞান উপলব্ধির সাধনা করছি, কিন্তু ততদিন আমি পরিপূর্ণতা অর্জন করবো না, যতদিন পর্যন্ত না আমার রাজ্যে উৎপন্ন সবাই সর্বজ্ঞতাজ্ঞান উপলব্ধি করতে সক্ষম এবং আরও অনেককে ঐ পথ প্রদর্শনে

সক্ষম ও মহামৈত্রীর চর্চা না করে।"

(ঝ) "যদিও আমি বুদ্ধত্বজ্ঞান উপলব্ধির সাধনা করছি, কিন্তু ততদিন আমি পরিপূর্ণতা অর্জন করবো না, যতদিন পর্যন্ত না ত্রিলোকের মানুষেরা আমার মৈত্রীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের দেহ ও মনকে পরিশোধিত না করে এবং এই পার্থিব জীবনধারার উর্দ্ধে উঠে না আসে।"

(ঞ) "যদিও আমি বুদ্ধত্বজ্ঞান উপলব্ধির সাধনা করছি, কিন্তু ততদিন আমি পরিপূর্ণতা অর্জন করবো না, যতদিন পর্যন্ত না মানুষেরা সর্বত্র আমার শিক্ষাকে ধারণ করছে এবং জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করছে। পরিশুদ্ধ ও শান্ত মন সৃষ্টির মাধ্যমে পার্থিব আকাংখা এবং দুঃখ যন্ত্রণায় স্হির অবস্হায় অবস্হান করার প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করছে।"

এগুলোই হলো আমার প্রার্থনা। যতদিন পর্যন্ত এগুলো পরিপূর্ণ না হয় ততদিন আমি যেন পরিপূর্ণতা অর্জন না করি। আমি অসংখ্য আঁধারে আলোর অফুরন্ত উৎস হিসেবে পরিণত হই। আমার প্রজ্ঞা ও কুশল সম্পদ সবার জন্যে উন্মুক্ত। সমস্ত জগত আলোকিত হউক এবং সকল দুঃখ-যন্ত্রণাগ্রস্ত মানুষ মুক্তি পথের সন্ধান লাভ করুক।

২। যুগ যুগ ধরে অসংখ্য পুন্যরাশি সঞ্চিত করে তিনি অমিতাভ বুদ্ধ হিসেবে, অফুরন্ত আলোর বুদ্ধ হিসেবে বা অসংখ্য জন্মের বুদ্ধ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি তার পবিত্র বুদ্ধ রাজ্যে শান্ত স্নিগ্ধতার সাথে অবস্হান করে সমস্ত প্রাণীকে তাঁর রাজ্যে আগমনের জন্যে তাঁর শিক্ষার মাধ্যমে আলোকিত করেছেন।

বুদ্ধের এ পবিত্র রাজ্যে কোন প্রকার দুঃখ যন্ত্রণা নেই। ওখানে পরম সুখ এবং শান্তিতে ভরপুর। ঐ রাজ্যে যারা বসবাস করে তারা যখন ইচ্ছা তখনই পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যদ্রব্য এবং সকল প্রকার আকর্ষণীয় দ্রব্য সামগ্রী তাদের হস্তগত হয়। যখন মৃদু সমীরণ প্রবাহিত হয় তখন মণি-মুক্তা দ্বারা ভারাক্রান্ত বৃক্ষের শব্দ বুদ্ধের

পবিত্র শিক্ষার সুরেলা ধ্বনিতে ভরে যায় এবং ঐ শব্দ যারা শ্রবণ করে তাদের মনও কোমলতায় ভরে যায়।

পবিত্র এ রাজ্যে অসংখ্য সুরভিত পদ্ম ফুল যার প্রতিটিতে রয়েছে অপূর্ব পাপড়ি যা অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্যে আলোকিত করে চারিধার। পদ্ম ফুলের রশ্মি প্রজ্ঞার পথকে আলোকিত করে এবং যারা বুদ্ধের পবিত্র শিক্ষা শ্রবণ করে তারাই পরম শান্তির দিকে অগ্রসর হয়।

৩। দশদিকের সকল বুদ্ধগণ অমিতাভ বুদ্ধের অসংখ্য আলো এবং অসংখ্য জীবনের প্রশংসা করছেন।

সুতরাং যে যতবেশী বুদ্ধের নাম শ্রবণ করবে এবং আনন্দের সাথে তা গ্রহণ করবে, তার মন এবং বুদ্ধের মন এক হবে। পরিশেষে সে মহা আনন্দময় এবং পবিত্রময় বুদ্ধ রাজ্যে তিনি আবির্ভূত হবেন।

যারা পবিত্র ঐ রাজ্যে উৎপন্ন হবেন, তাঁরা বুদ্ধের অসংখ্য জন্মের অংশীদার হবেন; এবং তাদের মন সবসময় সমস্ত দুঃখভোগী প্রাণীর প্রতি করুণাসিক্ত হবে এবং তাঁরা পরিস্কারভাবে বুদ্ধের মুক্তির পথ প্রচারে সক্ষম হবেন।

এ প্রার্থনায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা পার্থিব আসক্তি হতে দূরে থেকে এই পৃথিবীর অনিত্যতাকে অনুধাবন করবেন। ফলে তাঁরা তাঁদের অর্জিত সমস্ত পুন্যরাশি সকল প্রাণীর জন্যে উৎসর্গ করতে পারেন। তাঁরা তাঁদের জীবনের সাথে অন্যের জীবনের অখন্ডতা প্রকাশ করবেন, মায়া মরীচিকা এবং দুঃখযন্ত্রণার সময়ে, এমনকি এই পৃথিবীর আসক্তিরূপ বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের সময়েও তাদের এই অখন্ডতা বজায় থাকে।

তাঁরা এই জীবনের বাঁধা এবং অসুবিধার কথা জানেন, এমনকি বুদ্ধের অন্তরে সুপ্ত অসংখ্য করুণার কথাও তাঁরা বুঝেন। তাঁরা মুক্তভাবে বিচরণ করতে পারেন। এমনকি মুক্তভাবে বিচরণ করবেন কি করবেন না, তাও তাঁদের ইচ্ছার উপর নির্ভর

করে। কিন্তু তাঁরা বুদ্ধের করুণায় অনুপ্রাণিতদের জন্যে মৃত্যুর পরে অপেক্ষাও করতে পারেন।

সুতরাং যদি কেহ অমিতাভ বুদ্ধের নাম স্মরণ করে, তাকে তা সঠিক বিশ্বাসের মাধ্যমে স্মরণ করার জন্যে উৎসাহিত করা প্রয়োজন; যাতে সেও বুদ্ধের করুণা লাভে সক্ষম হয়। এই পৃথিবীর পার্থিব ভোগ বিলাসের মহা আগুনের মধ্যে অবস্হান করলেও সকলেরই উচিৎ বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করা এবং অনুসরণ করা।

যদি মানুষেরা সত্যিই আন্তরিকতার সাথে সর্বজ্ঞতাজ্ঞান লাভে আগ্রহী হয় তাদেরকে অবশ্যই বুদ্ধের উপর বিশ্বাস স্হাপন করতে হবে। সাধারণ মানুষের দ্বারা বুদ্ধের প্রকৃতি নির্ণয় করা বড়ই দুষ্কর ব্যাপার। এজন্য প্রয়োজন তাঁর শিক্ষা হতে সহযোগিতা নেয়া।

৪। বুদ্ধ অমিতাভ আমাদের থেকে দূরে নয়। তাঁর পবিত্র রাজ্য পশ্চিম দিকে বলে বর্ণনা থাকলেও তিনি ধার্মিক ব্যক্তির হৃদয়ের মাঝে অবস্হান করছেন।

যখন মানুষেরা মনে মনে বুদ্ধ অমিতাভের উজ্জ্বল সোনালী দীপ্ত প্রতিকৃতি অংকন করে, তখন ঐ ছবি চুরাশি হাজার প্রতিকৃতিতে পরিণত হয়। আবার প্রতিটি ছবি চুরাশি হাজার রশ্মির মাধ্যমে এই পৃথিবীকে আলোকিত করে। এই পৃথিবীতে যারা অমিতাভ বুদ্ধের নাম স্মরণ করে, তাদের কাউকে অন্ধকারে রাখা হবে না। তিনি সবাইকে মুক্তির আলো প্রাপ্তির জন্যে সহযোগিতা করে যাবেন।

বুদ্ধের প্রতিকৃতি দর্শনের মাধ্যমে আমরা তাঁর মনকে বুঝতে সক্ষম হবো। বুদ্ধের মন মহাকরুণায় ভরপুর, যারা তাঁকে বিশ্বাস করে তাদের মাঝে এবং যারা মূর্খ ও অমনোযোগী তাদের মাঝেও তাঁর মহাকরুণার স্পর্শ লক্ষ্য করা যায়।

যাদের মধ্যে বিশ্বাস আছে, তিনি তাদেরকে তাঁর পথে আসার শ্রেষ্ঠ সুযোগ প্রদান করেন। বুদ্ধের এই দেহ সর্বত্র সমান। যিনি বুদ্ধের কথা ভাবেন, বুদ্ধও তাঁর কথা ভাবেন এবং তাঁর মনের মাঝে সহজেই উপস্হিত হন।

বুদ্ধের দ্বারা নির্দেশিত মুক্তির পথ

তার অর্থ এই যে, যখন একজন ব্যক্তি বুদ্ধের কথা স্মরণ করেন; তখন তার চিত্তও বুদ্ধ চিত্তের ন্যায় পবিত্র ও সুখ শান্তিতে ভরে উঠে। অন্য কথায় বলতে গেলে তখন তাঁর মন বুদ্ধের মনের ন্যায় হয়ে যায়।

সুতরাং প্রত্যেকটি মানুষ পরিশুদ্ধ ও আন্তরিক বিশ্বাসের মাধ্যমে নিজের মনকে বুদ্ধের মনে পরিণত করতে পারে।

৫। বুদ্ধ বিভিন্ন মহিমায় আবির্ভূত হতে পারেন এবং মানুষের ভক্তি ও শ্রদ্ধার মাধ্যমে তিনি বিভিন্নরূপে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হন।

তিনি স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হওয়ার জন্যে সম্পূর্ন আকাশকে ঢেকে দেয়ার ন্যায় তাঁর দেহকে প্রসারিত করতে পারেন। তিনি নিজেকে প্রকৃতির মাঝে পরিমাণ অনুসারে ক্ষুদ্র, সময়ে আকৃতি, সময়ে শক্তিতে, সময়ে মনের মাঝে এবং সময়ে ব্যক্তিত্বের মাঝেও তাঁর মহিমাকে রূপান্তরিত করতে পারেন।

কিন্তু সময়ে তিনি শ্রদ্ধার সাথে যারা তাঁর নাম স্মরণ করেন, তাঁদের নিকট উপস্হিত হতে পারেন। ঐ সময়ে তিনি ২ জন বোধিসত্ত্বকে সাথে নিয়ে হাজির হন। তাঁদের একজন হলেন অবলোকিতেশ্বর, যিনি করুণাসম্পন্ন বোধিসত্ত্ব বলে মনে করা হয়; এবং অন্যজন হলেন মহাস্হমা প্রাপ্তা, যিনি প্রজ্ঞাসম্পন্ন বোধিসত্ত্ব বলে ধারণা করা হয়। বুদ্ধ অমিতাভের মহিমা পৃথিবীর সর্বত্রই বিদ্যমান, কিন্তু শুধুমাত্র শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিরা তা উপলব্ধি করতে সক্ষম।

যারা ইহজীবনে তাঁর এ মহিমা দর্শন করে, তারা অফুরন্ত সন্তুষ্টি এবং সুখ ভোগ করে থাকে। অধিকন্তু যারা প্রকৃত বুদ্ধের দর্শন লাভ করে তারা ধারণাতীত সৌভাগ্যবান এবং শান্তি সুখ উপলব্ধি করে।

৬। যেহেতু বুদ্ধচিত্ত সমস্ত প্রাণীর প্রতি সদয় এবং করুণা সম্পন্ন, সেহেতু তিনি সকলকে রক্ষা করবেনই।

তবে, বেশীর ভাগ পাপী মানুষ যারা অকল্পনীয় খারাপ কাজ করে, যাদের মন লোভ, দ্বেষ ও মোহে পরিপূর্ণ, যারা মিথ্যা বলে, গল্পবাজ, অপব্যবহার করে এবং প্রতারণা করে, যারা হত্যা করে, চুরি করে, ও ব্যভিচার করে, যাদের জীবন খারাপ কাজের মাধ্যমে অতিবাহিত হয়ে আসছে, তাদেরকে পৃথক পৃথক ভাবে অসংখ্য সময় ধরে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

একজন সৎ বন্ধু যেমন বিপদের সময়ে বন্ধুর পাশে এসে দাঁড়ায় এবং তাকে লক্ষ্য করে বলে, "তুমি এখন মৃত্যুর সম্মুখীন, তুমি তোমার পাপকর্মকে মুছে ফেলতে পারবে না। কিন্তু তুমি অসীম করুণাময় অমিতাভ বুদ্ধের নাম স্মরণ করে তাঁর পথ অনুসরণ করতে পারো।"

যদি পাপ কর্ম সম্পাদনকারীরা একাগ্রচিত্তে পবিত্র অমিতাভ বুদ্ধের নাম স্মরণ করে, তাহলে তাদের দ্বারা কৃত সব পাপকর্মের বিপাক হতে রেহাই পেয়ে মুক্ত হতে পারে।

যদি শুধু বার বার পবিত্র অমিতাভ বুদ্ধের নাম স্মরণ করে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অমিতাভ বুদ্ধের উপর তার একাগ্রতা চিত্ত উৎপন্ন করতে পারে, তাতেও তার পাপকর্ম মুক্ত হয়।

অতএব, জীবনের শেষান্তে যারা পবিত্র অমিতাভ বুদ্ধের নাম স্মরণ করবে, তারা বুদ্ধের সাক্ষাৎ পাবে এবং করুণা সম্পন্ন ও প্রজ্ঞাবান বোধিসত্ত্বেরও সাক্ষাৎ পাবে এবং তাদের মাধ্যমে বুদ্ধ ভূমিতে পথ নির্দেশনা দেয়া হবে, যেখানে তারা সবাই শুভ্র পদ্মের ন্যায় প্রস্ফুটিত হবে।

সুতরাং, তাদের সবার উচিৎ "নমো অমিতাভ বুদ্ধ" শব্দটি মনে রাখা অথবা সম্পূর্ণ অন্তর দিয়ে অফুরন্ত আলোর বুদ্ধও তাঁর সীমাহীন জীবনের উপর বিশ্বাস স্হাপন করা।

২

বুদ্ধভূমি শুদ্ধাবাস

১। অসংখ্য আলোকে আলোকিত বুদ্ধ সীমাহীন জীবন থেকে তাঁর শিক্ষা প্রচার করে আসছেন। তাঁর রাজ্যে কোন প্রকারের দুঃখ কষ্ট নেই, নেই কোন অন্ধকার এবং প্রতিটি মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হয় আনন্দের মাধ্যমে। তাই এই ভূমিকে শুদ্ধাবাস বলা হয়।

এ শুদ্ধাবাসের মধ্যস্হলে পবিত্র জলে আবৃত একটি জলাধার আছে, ঐ জল স্বচ্ছ এবং ঝলমল করে, যার ঢেউ সোনালী বর্ণের বালুর তীরের সাথে মৃদু আঘাত করে। এদিকে সেদিকে রথের চাকার ন্যায় বড় বড় পদ্ম ফুল প্রস্ফুটিত হয়ে বিভিন্ন আলোকে আলোকিত হয়ে আছে। নীল বাতি থেকে নীল আলো, হলুদ বাতি থেকে হলুদ আলো, লাল বাতি থেকে লাল আলো, সাদা বাতি থেকে সাদা আলোয় পদ্ম ফুলগুলোকে দেখলে অপূর্ব মনে হয় এবং ফুলগুলোর সৌরভে বাতাসও সুরভিত হয়।

জলাধারের এক প্রান্তে স্বর্ণ, রৌপ্য, নীলকান্তমণি এবং স্ফটিক দ্বারা তৈরী কারুকার্যময় বৃহৎ চত্বর যেখান থেকে উজ্জ্বল মার্বেল পাথরের সিঁড়ি জল পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। অন্য প্রান্তে নীচু পাঁচিল এবং সূক্ষ্মাগ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভ বিশেষ পানির উপরে ঝুলছে এবং পাতলা কাপড়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত মূল্যবান রত্ন। এ দুটির মাঝখানে সুগন্ধিযুক্ত তরু বিথীকা এবং কুসুম কানন।

স্হানটি সৌন্দর্য্যে ঝলমল করছে এবং বাতাসে স্বর্গীয় সুরের স্পন্দন শুনা যায়। দিবা রাত্রি ছয়বার আকাশ থেকে মনোমুগ্ধকর আভাযুক্ত ফুলের পাপড়ি পতিত হয় এবং ওগুলো লোকেরা সংগ্রহ করে ফুলদানিতে করে অন্যান্য সকল বুদ্ধভূমির জন্যে এবং দশসহস্র বুদ্ধের উদ্দেশ্যে পূজা করে থাকে।

২। এ বিস্ময়কর পৃথিবীতে অনেক পাখি আছে। যেমন তুষারের ন্যায় শুভ্র সারস পাখি, রাজহংস, জমকালো রংয়ের ময়ূর, ক্রান্তীয় ঋতুর স্বর্গীয় পশুপাখি এবং ছোট ছোট পাখিদলের মন মাতানো গানের মূর্ছনা সত্যিই উপভোগ্য। বুদ্ধভূমি শুদ্ধাবাসের পাখিরা তাদের সুমধুর গানের সুরে বুদ্ধের শিক্ষাকে প্রচার করছে এবং তাঁর গুণরাশির প্রশংসা করছে।

যারাই এ সুমধুর ধ্বনি শ্রবণ করেন তারাই স্বয়ং বুদ্ধের সুরলা মধুর ধ্বনি শ্রবণ করেন এবং বুদ্ধের অন্যান্য অনুসারীদের সাথে এক হয়ে নূতন বিশ্বাস, আনন্দ ও শান্তিতে উদ্ভাসিত হন।

পশ্চিমা মৃদু সমীরণ ঐ শুদ্ধাবাসের গাছের পাতার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। স্বর্গীয় উদ্যানের পর্দার ভিতর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সৌরভ এবং মধুর গানের মূর্ছনা।

মানুষেরা স্বর্গীয় এ গানের ক্ষীন প্রতিধ্বনির মধ্যে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের গুণের কথা শুনতে পায়। তখন এ সব গুণরাজির মহত্ত্বতাই শুদ্ধাবাসের মধ্যে বাস্তবে প্রতিফলিত হয়।

৩। কি কারণে এ শুদ্ধাবাসের বুদ্ধকে অমিতাভ বুদ্ধ বলা হয় ? কারণ তিনি অসীম আলোর উৎস এবং অসংখ্য জীবনের আঁধার। আরও উল্লেখ্য যে শুদ্ধাবাসের ভিতরে এবং বাহিরে বুদ্ধের অত্যুৎকর্ষ শিক্ষার আলো অব্যাহতভাবে বিকশিত হচ্ছে। ইহার কারণ তাঁর প্রানবন্ত করুণার বাণী কখনও অসংখ্য প্রাণী এবং মহাকালের মধ্যেও ক্ষীন হয় না।

শুদ্ধাবাসে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরা, এবং যাঁরা প্রকৃত পক্ষে সর্বজ্ঞতাজ্ঞান উপলব্ধি করেছেন তাঁরা পুনঃ এ মোহময় এবং অনিত্যময় জগতে জন্মগ্রহণ করবেন না।

এ কারণে যাঁরা বর্তমান বুদ্ধের শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়ে নূতন জীবন

শুরু করেছেন, তাঁরাও সংখ্যার দিক থেকে অনেক।

সুতরাং প্রত্যেক মানুষের উচিৎ একাগ্র চিত্তে বর্তমান বুদ্ধের শিক্ষার অনুশীলন এবং বুদ্ধ অমিতাভের নাম স্মরণ করা। এমনকি মৃত্যুর একদিন পূর্বে অথবা ৭ দিন পূর্বেও যদি কোন ব্যক্তি প্রকৃত শ্রদ্ধাচিত্তে বুদ্ধ অমিতাভের নাম স্মরণ করেন তাহলে ঐ সময়ে অমিতাভ বুদ্ধ তাঁর পবিত্র শিষ্যসংঘের মাধ্যমে পরিবৃত হয়ে মৃত্যু পথযাত্রীর সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে তাকে শুদ্ধাবাসে নিয়ে যাবেন।

যদি কোন ব্যক্তি অমিতাভ বুদ্ধের নাম শুনে তাঁর শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা উৎপন্ন করে, একাগ্র নিষ্ঠার সাথে তা অনুশীলন করে, তাহলে সে সর্বজ্ঞতাজ্ঞানও উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

অনুশীলন পদ্ধতি